

প্রকাশক : শ্রীমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
সীমান্ত
৬সি রাজকুমার চক্রবর্তী সরণী, কলকাতা-৭০০০০২

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ : অতলু বহু

মুদ্রক : শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনাথায়ণ প্রেস
১ রমাশ্রীসাদ রায় লেন, কলিকাতা-৬

মুচীপত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪)	
মধুসূদন শেখর	৯
অরুণ মিত্র (১৯০৯)	
শর্টকাটের খবর	৯
বিরাম মুখোপাধ্যায় (১৯১৪)	
কাঠিগরের শাদা	১০
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯১৭)	
মুক্তি	১১
মণীন্দ্র রায় (১৯১৯)	
চতুর্দশী	১২
চিন্তা ঘোষ (১৯২০)	
আখিনের ছুড়ি	১৩
গোলাম কুদ্দুস (১৯২০)	
কী যেন নেই কী যেন আছে	১৩
স্বভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০)	
সপ্তাহ প্রতিদিনই	১৪
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২১)	
জালিয়ানওয়ালা ফের	১৫
স্বাম বসু (১৯২৫)	
চাকিরা ঢাক বাজার খালে বিলে	১৭
কৃষ্ণ ধর (১৯২৬)	
জয় হে মাহুদ, জয় হে	১৯
বিতোষ আচার্য (১৯২৬)	
হুগুভ	২০
লিঙ্কেন্সর সেন (১৯২৬)	
পাথের কুড়োর ছন্ন মূর্তি	২১
মৃগাঙ্ক রায় (১৯২৭)	
আমার বাড়ি	২২

গোবিন্দ ভট্টাচার্য (১৯৩০)	
নিশ্চয় ধোয়াই	২৩
মিহির ঘোষদস্তিদার (১৯৩১)	
আমাকে ক্ষমা করো	২৪
অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৩২)	
গাইড	২৬
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (১৯৩২)	
স্বপ্ন, স্বাধীনতা	২৬
তরুণ সাংখ্য (১৯৩২)	
পাহাড়ের ঘাড়ে একাকী	২৮
বীরেন্দ্রনাথ সরকার (১৯৩২)	
দুঃখের মহত্ব	২৮
শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২)	
অন্ধবিলাপ	২৯
সুনীলকুমার নন্দী (১৯৩২)	
দুঃখের শরিক	৩২
সুনীল হাজরা (১৯৩২)	
স্বপ্নের কেতন	৩৩
মণীন্দ্র ঘটক (১৯৩৩)	
হবি তো হ	৩৪
তুচ্ছের বিনিময়ে	৩৪
শ্যামসুন্দর দে (১৯৩৩)	
মিনার	৩৫
ব্রবীন সুর (১৯৩৪)	
দীক্ষা নিতে হবে	৩৬
বাদল ভট্টাচার্য (১৯৩৪)	
আমার হৃদয় জুড়ে	৩৭
শিবশঙ্কু পাল (১৯৩৪)	
দুর্গেশনন্দিনী	৩৮
অমিতাভ দাশগুপ্ত (১৯৩৫)	
কর্ণ	৩৮

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯৩৫)	
প্রত্যাবর্তন	৩৯
রত্নেশ্বর হাজরা (১৯৩৬)	
ভবে	৪০
দীপেন রায় (১৯৩৭)	
১৩২৩	৪১
নীরেন্দ্র হাজরা (১৯৩৭)	
এক গেলাস তৃষ্ণা	৪২
সন্তোষ চক্রবর্তী (১৯৩৭)	
ভরুপকের জ্যোৎস্না	৪৩
কমলেশ সেন (১৯৩৮)	
আমি জানি না	৪৪
প্রদোষ দত্ত (১৯৩৮)	
একদিন সেইদিন	৫২
মণিভূষণ ভট্টাচার্য (১৯৩৮)	
২৫শে বৈশাখ ১৩২৩	৪৪
শুভাশিস গোস্বামী (১৯৩৮)	
শীতের সাপের মতো	৪৬
আনন্দ ঘোষ হাজরা (১৯৩৯)	
গতাহুগতিক	৪৬
শিবেন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৯)	
পাগলাঝোরায় গতিপথে	৪৭
উদ্যানপদ বিজলী (১৯৪০)	
হুঃখ নর হুঃখ নর	৪৮
পবিত্র মুখোপাধ্যায় (১৯৪০)	
স্বপ্নচারণার ভূমি	৪৮
শিশির সামন্ত (১৯৪০)	
অসংগতি	৪৬
অজিত বসু (১৯৪১)	
ভূত ও ভবিষ্যৎ	৫৫

অমিয় ধর (১৯৪১)	
কালের সন্ধ্যাই সমাগত	৫১
মুকুল গুহ (১৯৪১)	
আমাদের জীবন যাপন	৫২
অলককুমার চৌধুরী (১৯৪৪)	
এখনো সময় আছে	৫৩
কালীকৃষ্ণ গুহ (১৯৪৪)	
বসন্তের হাওয়া	৫৪
শুভ বসু (১৯৪৬)	
প্লাবন জোকার	৫৫
অমিতাভ গুপ্ত (১৯৪৭)	
ধনন পর্ব	৫৬
অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭)	
একসাথে	৫৬
মনোজ্ঞ নন্দী (১৯৪৭)	
যে আছে নিজের শক্ত মাটিতে ঝাড়িয়ে	৫৭
অজয় নাগ (১৯৪৮)	
এসো পোশাক	৫৭
অরবিন্দ পাল (১৯৫০)	
অরণ্যে জীবন	৫৮
শান্তু বসু (১৯৫২)	
ফ্যাকাশে ধান গাছের মতো	৫৯
জয় গোস্বামী (১৯৫৪)	
রয় যে কাউল শূন্য হাতে	৫৯
মৃদুল দাশগুপ্ত (১৯৫৫)	
রান্নাঘর	৬০
অতনু বসু (১৯৫৭)	
প্রোমাংসুর লাশ	৬০
পরিচয় বসু (১৯৫৮)	
কবি প্রসবিনী মাতা	৬১
মলয় পাত্র (১৯৫৯)	
বস্তা	৬৩

আমাদের কথা

এই সংকলনটি সীমান্ত-এর কবি-বন্ধুদের দ্বারা সংকলিত ও সম্পাদিত। এটি একটি অব্যবসায়িক বোধ প্রকাশনার প্রয়াস মাত্র। বাঙলা কবিতার বৃহত্তর সেই বাতায়নটি আজ খণ্ডিত। যেখানে দাঁড়ালে সমস্ত আকাশটা এক ঝলকে চোখের সামনে জেগে উঠতো। দশকের তত্ত্বজ্ঞান আর গোষ্ঠীগত আক্ষাণনে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা আজ বাঙলা কবিতার বাতায়নটিকে দীর্ণ করে তুলেছে। এই পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা এই প্রকাশনার হাত দিয়েছি। আর বেছে নিয়েছি এই বছরের শারদ সংকলনগুলির প্রকাশ কালকে। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয়েছে কবি শুধু সময় নিয়ে কবিতা লেখেন না সময়ও স্বযোগ মতো বাধ্য করে তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে। অর্থাৎ কালের উদ্দেশ্যও প্রতিকলিত হয়ে যায় কবিতার মধ্যে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে কবিতাগুলি সংকলিত করার চেষ্টা করেছি মাত্র। আশা করবো এর সার্থকতা বা ব্যর্থতা যোগ্য পাঠকের দ্বারা নির্ধারিত হোক।

কবিতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে খুব বেশি যে নিরপেক্ষতার মুখচ্ছদটি আমাদের আঁটতে হয়েছে তা নয়। মূলত সেই সব সুপরিচিত কবির কবিতা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমরা পছন্দের কাজটি সমাধা করেছি—যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কবিতাকে মৌল তাৎপর্থে সর্বজনীন করে তুলছেন। এবং দীর্ঘকাল বিকাশশীল সংস্কৃতি নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাঙলা কবিতার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র রূপায়ণে সার্থক করে তুলছেন কবিতার বাস্তবতা। কিছু পরিচিত কবি আমাদের এই সংকলনে অল্পস্থিত থেকে গেলেন এই কারণে যে এটি একটি বিশেষ এক মুহূর্তের প্রকাশনা কালকে রূপায়িত করা হলো বলে। এখানে আমরা সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতার সামগ্রিক রূপটি বৃহত্তর পাঠক-সাধারণের কাছে তুলে ধরার কোনো চেষ্টাও করিনি। শুধু একটা কথা, যেটা আমাদের বিশ্বাসের গোড়ার কথাও বটে।—আমরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনে বিশ্বাসী নই। কবিতায় তো নয়। আর যেখানে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট হোক না কেন, কবিতায় হয় না। তরুণ কবিদের ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে তাঁদের ক্রম পরিণতির ঝোঁকের ওপর। এ অল্পমান ভবিষ্যতে তুল প্রমাণিত হতেও পারে। ক্ষতি নেই। তবু তাঁদের অগ্রগমনের একটা ঝোঁক অন্তত এখানে ধরা রইল ভবিষ্যতের হাতে।

অধিকাংশ কবিতা ‘লিটল ম্যাগাজিন’ সম্পাদক নামক দ্বীচিদের দ্বারা প্রকাশিত শারদ সংকলনগুলি থেকে সংগৃহীত। সীমান্ত-এর কবি-বন্ধুদের পক্ষ থেকে তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রেসের কর্মী-বন্ধুদের সহযোগিতার ক্ষুদ্র ধন্যবাদ।

দীপেন রায়

প্রোমেন্স মিত্র

মহাস্তর শেষে

জানি না এ মহাস্তর

শেষ হবে কিনা,

মহা প্রলয়ের এক মহা বিস্ফোরণে !

‘সেনটরাস’ না কি কোনো

আরো দূর প্রহেলিকা ‘গ্যালাক্সি’-র

নাভি-মূল থেকে

অমা গাঢ় গুপ্ত রক্ত এক

অনিবার্য আকর্ষণে

ত্রিভুবন শোষণের পর

আবার তা করবে উদ্গিরিত ?

সে ধ্বংস লীলার পর

এ সপ্তম মহু কাল শেষে

এ স্রষ্টি কি হবে আর

প্রাণে কল্লোলিত !

হয় যদি

তবু সেই নতুন স্রষ্টিতে

মানুষের মত কোনো

অসহায় প্রাণের প্রতিভূ

অকারণে, শুধু ক’টি শব্দ গোঁথে

নিরর্থক ছন্দিত বাক্যে

হবে কি রুতার্থ ?

অরুণ মিত্র

শার্টকাটের খবর

নম্রা শড়কে মেঘ জমছে, কারাগার ভেসে আসছে ॥

—কেন, কারাগার কেন ? সিঁথে বাস্তব কেউ কাঁদে

কখনো শুনিনি ।

—তা বলেছেন ঠিক । শোনাটা বড় রহস্যময়
ক্রিয়া । লতি নড়ে পাতি নড়ে তারপর চুপচাপ, ওই
মিলিয়ে গেল ঢেউ । মোট কথা একটু অপেক্ষা করলেই
আর শুনতে পাওয়া যায় না । যাবতীয় শর্টকাটে
এমন হয় ।

—কেন, অপেক্ষা করার কথা কেন ?

—সেটা এক হিসেবছুট সময় । সেইসে
নেওয়ার জন্তে লাগে ! শেষ পর্যন্ত দেখবেন
হাসিহাসি মুখ স্বর্গের সিঁড়ি বেঁধে, যেখান
থেকে ধাপে ধাপে উঠে গেলে সুখশান্তির
ঘর । তার আগেই অবিস্তি কান্নাটার ধূরে
সাক্ষ । মেঘ জমছে, জমতে দিন ।

বিরাম মুখোপাধ্যায়

কাঠটগরের শাদা

না-পূর্ণ না-শূন্য বীতভুজ নই নই
মাকারির মাপে খুলি, মনীষার প্রাজ্ঞ বিশেষণে
স্বভি-স্বাবকতা কালো শজারুর কাঁটা
অল্পপল অশেষক বিবেককে জর্জর বিধছে,—
অপূর্ণের ঘটের পল্লব ও শান্তি শুদ্ধি সিদ্ধি
নয়-কোনো সহৃদয় শুদ্ধোদন-সহযাত্রী হবো
শাকারে হুনের ছিটে উপার্জিত নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্য
অবনমনীয়তার পান্টা পোক্ত দেবদারু-মেরু,
খ্যাতির কাঙালপনা কাঁড়িকাঁড়ি দৌলতলালসা
মুক্ত হলে প্রাপ্তি ছিদ্রহীন প্রেয়তম উত্তরণ,—
বিপরীতে ইড়া ও পিঙ্গলা আর স্নায়ুর গীড়নে
প্রতিবেধ আছে—ব্রহ্মহৃদয় কিংবা কঠোপনিষদ

কূটকচালের কটকিত ষাণ্ডিক সংকটশূন্ত
 ধূলো-মলা-ছাই ঝেড়ে মুছে
 গলোজীর গোত্রহীন প্রশাখার খাড়ি-মোহনার
 শাস্ত স্বচ্ছ টলটল নদীর আরনা-না ঈর্ষা না—
 পুণ্যস্থানে অপার্থিব ঝড়িয়ার লেশকণা নেই—
 সিঁদুরে মেঘের ভয়ে গেরুয়ার মজ্জ-নামাবলী
 আতুল এ-গারে জড়াবো না। সিদ্ধি ঋদ্ধি জলাঞ্জলি।

কিছু উচকপালে ও র'য়াদাবসা উটকো ধনীর
 শব্দশিল্পী বুল-বারান্দার টেরাকোটা টবে-টবে
 টকটকে ব্রাকশ্রিঙ্গ দেদার ফুটছে,—ফুটুক না—
 আমার এ-আড়িনার না-পছন্দ নিতৃত্তির কোণে
 কাঠটগরের গুচ্ছ শুভ্রতার নব্র প্রতিনিধি ॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মুক্তি

ডাকে পাঠানো তোমার কবিতাটি পেয়েছিলাম।
 অমুরোধ ছিল যদি কোথাও ছাপা হয়।
 বয়সে তরুণ, হাতের লেখা উজ্জল, যত্নে দীপ্তিতে
 টলমল করছে অক্ষরগুলি।
 অহুমান করতে পারি কী ভাবে লেখা হয়েছিল এই কবিতা।
 একটি স্থান্য চিত্রকল্প বা একটি উজ্জল পংক্তি
 উপহার দেবার জন্তে নয়।

এই কবিতা! লেখার সময় তুমি আক্রান্ত হয়েছিলে,
 কেউ আলোড়ন তুলেছিল তোমার রক্ত চলাচলে,
 গভীর রাত পর্যন্ত তুমি জেগেছিলে।
 এই কবিতার তোমার হৃদপিণ্ডের বহুধার আভাস,
 ভালোবাসার উচ্চারণ আর বিচ্ছেদের সক্রম আর্তি।

যেন তুমি নিজেকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তৈরি করেছিলে

স্বকালের লাল গোলাপ ।

তোমার এই কবিতা ছাপা না হলে

কী এসে যায় পৃথিবীর ?

অথচ এই কবিতাটির দরকার ছিল । কেননা এই

কবিতা লিখেই

তুমি নতুন মানুষ হয়ে উঠেছ । এই কবিতাই

অনেক দিনের যত্নশীল গোড়ানী আর বিরহের পর

তোমাকে দিয়েছে মুক্তি ॥

মণীন্দ্র রায়

চতুর্দশী

তোমার সমীপে যেতে নষ্ট হল সমস্ত জীবন

পাশপোর্টহীন একা অনাগরিকের বহিষ্কারে ;

শূন্যের ঘন্টার আজো প্রতিধ্বনি প্রহত এমন

তোমারই আশ্রয় খোঁজে অনিদ্রার রাত্রির কান্তারে ।

কী জানি কী অপরাধে অর্ধপথে ধ্বসে গেল সেতু,

নিশ্চিত কক্ষের বাইরে আঁকি ব্যর্থ দীর্ঘ প্যারাবোলা,

নেই তিথি, ঋতু, স্বপ্ন, এ অস্তিত্ব যেন বা অহেতু,

সঙ্গীহীন অন্ধকারে ত্রাত্য এই দৃষ্ট অগ্নিগোলা ।

অথচ কতো-যে গেল সামান্য এ সঙ্কে আমায়

যতো তার তাম্রমুদ্রা অশ্রু ততো, অন্ন-কান্না মিশে

এমন আকৃতি, এই রক্তের মখিত অন্তঃসার

কালের পশুর গ্রাসে লুপ্ত হয়ে বরছে পুরীষে ।

নগরীর বাইরে আজো বসে আছি, হৃদয়ভিখারী,

ঢালো ওঠে স্বধা, প্রেম, কিংবা খোলো অগ্নি-ভরবারী ।

চিস্তা ঘোষ

আখিনের ঘুড়ি

রঙ-চটা এই ছবির

মুখগুলো কি বলে—

একটা মোম নেবে

আরেকটা মোম জলে ।

আকাশ কুহুম আছে

আছে মোমের দড়ি

কানের খুব কাছে

কি কথা বলে ঘুড়ি ।

গভীর জল, নীচে

রূপোর সাদা বালি

অন্ধকারে কে

দিচ্ছে করতালি ।

মেঘের মুখ কালো

নাপের মতো ঝুরি

যেন আকাশ খোঁজে

আখিনের ঘুড়ি ।

গোলাম কুদ্দুস

কী যেন নেই কী যেন আছে

ছিল, কিন্তু পুড়ে গেল ।

ছুরি বসিয়ে উড়ে গেল ।

ভাইকে ভাই দিল না ঠাই ।

মাকে করল দূর ছাই ।

নানা রঙা পাতাবাহার

টাকাবাহার ঝাড়ার আহার ।

শূন্য মাঠে নারীপ্রায়
 যা ছিল না গজিয়ে উঠল—
 অচেনারা চেনাশোনার
 ঢেউ তুলল,
 একসঙ্গে কত লড়ল, কত মরল,
 থাকে না-থাকার মাঝে দাঁড়িয়ে
 যা নেই তার স্বপ্ন দেখল ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
 সপ্তাহ প্রতিদিনই
 শিব নেই । ছি ! ছি !

সেই দুঃখে
 দক্ষযজ্ঞে
 বাননি দধীচি ।

ব্রজানন্দ হানা দিলে
 স্বর্গচ্যুত
 হল দেবতার—
 খোদ ইন্দ্র রণে ভয় দেন ।

তখন দধীচি ছাড়া
 দেবগণ
 অনন্ত উপায় ।

দধীচি ছিলেন প্রাণ ।
 তবে দেবতার পায়ে
 তাঁর অস্থি থেকে
 রক্ত নিখনের বজ্র—

বীর জয়
 একদা শাস্তির গর্ভে
 অথর্ব মূনির ঔরসে
 এবং প্রেতের গর্বে
 সারস্বত পুত্রের পিতা যিনি ।
 বিনা নামে বিনা অর্থে
 বিনা যশে
 সে বজ্র বানিয়ে যার
 নিজের অস্থিতে
 নেপথ্যে

সপ্তাহ

প্রতিদিনই

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

জালিয়ানওয়ালা ফের

স্বত্বের মুখাঙ্গি সেরে ফেরে ইতিহাস
 ইতিহাস আমাদের শ্মশানচণ্ডাল !
 নিজেকেই ঘুরে-ঘুরে জয়জয় ও মূর্দাফরাশ
 ফিরে আসে চিতা থেকে চিতার আগুনে হাত সঁকে
 হরিধ্বনি থেকে হরিধ্বনি মেখে ডোমকাক
 শামুকের গতি আসে, ইতিহাস হাঁটে ।
 সামনেও না পেছনে না—অগ্র কি পশ্চাদ্গতি নয়
 কুমকুমি-সাপের হাঁটা সরে পাশে-পাশে—
 ইতিহাস হাঁটে আর মড়ক পায়ের তালে কুমকুমি বাজায় :
 হচ্ছে-হচ্ছে হবে, রোসো, ধীরে স্বপ্নে হবে !

জালিয়ানওয়ালাবাগ হাঁটে জালিয়ানওয়ালাবাগ !

সংবিধান সংসদ কি গণতন্ত্র সবই

দিব্যি স্বপ্নস্বপ্নে ঠাণ্ডা ঘর—

দিব্যি স্বপ্নস্বপ্নে মস্ত্ ওমরাহ্-জারগিরদার-মৃত্ সুন্দির দিন ।

গণ-স্পর্শছাড় গণতন্ত্রে মিলবে সবই

হচ্ছে-হচ্ছে হবে, রোসো, ধীরেস্বস্থে সব-ই !

আপাতত তন্ত্র সার, যোগিনীচক্রের তান্ত্রিকেরা

ইতিহাসরঞ্জিনীকে ছায় কোল, চিরঅমাবস্তা-সিদ্ধি চায় ।

মানুষের বুকে পা তাতা-থৈ উলঙ্গিনী ধর্ম খাড়াধরা

সম্পত্তিপিশাচ পুরোহিতসাজে জাতপাত-নামাবলি নেয়—

হতে-হতে-হচ্ছে না, হচ্ছে না ? হবে অবশুই হবে ।

বেলুচি হয়ে আরুণ্ডাল কে যায়, কে যায় ?

যায় জালিয়ানওয়ালাবাগ ।

হচ্ছে-হচ্ছে হবে, রোসো, ধীরেস্বস্থে সব-ই :

হাভাতের মুখে অন্ন, অনিদ্রার চোখে ভাতঘুম

হুশিচিন্তা মাথায় পাবে নির্ভয়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয়

দারিদ্র্য দেশছাড়া হবে,—দূরদূর, ছ-গালে চুনকালি ।

কিন্তু আগে চাই মুক্ত বাগিজ্যেই লক্ষ্মীর বসত্

বাক্‌স্বাধীনতা—শ্রেফ সত্যিমিথ্যে নয়ছয় ম্যাজিক

ভোটপত্র বাঁধা বাঁধে, ভূমিদাস দাসত্রে জোয়ালে

ঠ্যাঙাড়ে সেনারা চরবে গঞ্জেগাঁয়ে গণতন্ত্রত্রাণে

আর চলবে লাঠি গুলি ভূপালের গ্যাস জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ।

—কেমন, হচ্ছে তো, নাকি হচ্ছে না ? আই, ধীরে স্বস্থে হবে

আরুণ্ডাল ও কান্দুসারা-য় মুখ দেখায় অবিকল

জালিয়ানওয়ালা বাগ !

রাম বসু

চাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে

আলো আর অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
মাঝে মাঝে মনে হয় অনায়ত্ত রহস্ত হয়ে গেছে
অথবা উত্তুঙ্গ হাওয়ার উদ্যম উল্লাসে
মহাকাশ থেকে পাজর অবধি দীর্ঘ ছায়াপথ
সেখানে এমন কিছু রয়ে গেছে যা অনায়ত্ত
তাকে কোনদিন জানবো না

গতরাতে বড় সড় ধরনের এ্যাকসান হয়ে গেল
এল এম জি চলেছে, লাশ তো নেয়েছে গোটা তিনেক
ভোরবেলা ক্লাবের রকে একটু গড়িয়ে কাক-ভোরে উঠতেই
এই কথা মনে হল তার
পাইপগানের নলে আদরের হাত বোলাতে বোলাতে মনে হল
প্রতি মুহূর্তেই নতুন করে ভারসাম্য পেতে হয়
না হলে এই সৌরবস্তুর সঙ্গে তাকেও মিলিয়ে যেতে হবে
অন্তহীনতার, অন্তহীন শূণ্যতার

অথচ কোথায় সেই ভারসাম্য ?
লাটুর মতো ঘুরে ঘুরে, ঘুরে ঘুরে
বৃত্তাকারে, পৌনপুনিকতার, — জীর্ণ, ক্ষয়ে-যাওয়া
কখনো বেহালার কোমল আলাপে
দেওয়ালগুলো উড়ন্ত পাখির ডানা
কার্নিসে জানালায় রাতকানা দীর্ঘখাস, আর বহুদূরে
জলপ্রপাত, ফসলের মর্মর, কুম্বরেণু-অন্ধকার
তখন, নিজেরই অজ্ঞাতে, চোখের কোণে জলের ঝিকমিক

কোথাও যদি কোন অদৃশ্য গুপ্ত দরজা থাকতো
যার ভিতর দিয়ে স্বড়ক্লের পরে স্বড়ক্ল পার হয়ে
পার হয়ে গগন-ঠাকুরের ছবির মত রহস্ত সোপান

সহসা প্রদীপের মায়াবী আলোয় উদ্ভাসিত আদি মা ম্যাডোন
 অথবা গীর্জার অর্গানে অবরোধ ভাঙা অশ্রুর নিখরৈর স্বপ্নভঙ্গ
 হাড়ে মজ্জার ঘৃণ ধরা অঙ্ককারের নীচে আলোর বাকানো তলোয়ার
 আর নিফলক আকাশের অঙ্গরাগে উষার গালের অশ্রুট ডালিম
 তা হলে ভয়ঙ্কর অবরোধে চাপা পড়তো না সে
 হয়তো বৈদুর্ঘ্যমণি স্থান আর কাল হতো তার পরিমাপ
 সে-ও হতে পারতো সুষমায় সূর্যের সন্নিহ

ভোর না হতে নামহীন অস্তিত্বের ছোবলে ছোবলে নীল
 সে যখন মাথার যন্ত্রণা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়ালো
 তখন চোখদুটো জবা, রংগের শিরা পাকানো-দড়ি
 তখন থুখুড়ে ট্রাম ষণ্টা ছলিয়ে নেমে পড়েছে রাস্তায়
 তার মনে হল সূর্য বুঝি গ্রহনক্ষত্রের ভিড়ে পথ হাতড়ে অবসর
 আর সংখ্যাভীত পোকামাকড়ের ধারালো দাঁত গাছের শিকড়ে বাকলে
 তাকেও এই সব নিয়েই ভারসাম্য খুঁজে পেতে হবে নীল শূণ্যতার
 সার্কাসের ওস্তাদ ট্রাপিজের খেলোয়াড়ের মতো

অথচ মুক্তি কিছুতেই নেই, আনন্দ নেই, রোমাঞ্চ নেই কিছুতেই
 অদৃশ্য অথচ জন্মদ-কঠিন নিগড়ে পা দুটো আঠে-পিঠে বাঁধা
 আলোহীন তাপহীন ক্ষীণ মৃত্যুর আরোহণ পরিসর শুধু ধ্বনিত
 শুধু শব ঢাকা চাদরের মতো সেও উড়ন্ত দিকচিহ্নহীন তৈমুর হাওয়ার হুকাবে
 আর সে এক শূণ্য থেকে অণু শূণ্যে নৈঋতে, ক্রম বিলুপ্ত কালো বিন্দু

অবশ্যই ভীষণ ভয় লাগছিল তখন
 অনিশ্চিত আতঙ্ক বুকের নিরাকার গুহার অবরুদ্ধ উন্মাদ ঘুণি
 টালমাটাল নৌকো, ফুটি-ফাটা ঠোঁট, বমি-বমি ভাব
 মনে হল তার হাত পা নাক মুখ চোখ
 নন্দ্র বলয়ের কুহেলি জটিল যদি হতো তন্ত্রাচ্ছন্ন মগ্ন আলাপ
 হয়তো তার আহত গৌরব হতো অপরিমেয়তা, সমুদ্র শব্দের বোষণা
 বিস্তারের বিপুলতার তার চৈতন্যের সীমা হতো মহাজগতের দিকচক্রবাল

তা আর কিছুতেই হল না

সে বৃথাই হাত বোলালো পাইপগানের নলের ওপরে

সহসা মনে হল গ্রহ নক্ষত্র ছিটকে এসে ঢুকে পড়ছে তার ভেতর

অন্তরীক্ষের অন্ধকার বলয় থেকে চাপ-চাপ ভরাবহ নিকষ তামস

তার সত্তার ওপর সজোরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে যরণগণ বর্ষারের মতো

সেখানে জীবনের কোন স্পন্দন নেই, মৃত্যুর শীতলতাও নেই

সূর্যহীন সময়ে দীর্ঘ প্রস্তাবনা ভূমিতলের অবসন্ন পাণ্ডুরতার

আর সে ক্রমাগত হয়ে যাচ্ছে পাতাল থেকে পাতালের তলায় নিশ্চল বোবা

হিমবাহ

অসহায় অল্পচার আর্তিনাদ তার গলায় ডেলার মত পাকিয়ে

আর পরিচিত পৃথিবী, তার অস্তিত্ব, খালে ভাসা বাসি মড়ার মুখ

ফ্যাকাশে-ফ্যাকাশে চাঁদের মত নির্জনতা, সে ভেসেই চলেছে, ভেসেই চলেছে

নিরালস্য শূণ্যতা, পায়ের নীচে হাঁ-করা ভৌতিক শূণ্যতা

সে আর কিছু ভাবতে না পেরে পাইপগান ঠেকালো তার রগে

তার রগে রক্তাক্ত গহ্বর, অনাদি কালের তৃপ্তিহীন ক্ষুধার্ত গহ্বর

থুথুড়ে ট্রাম গলার ঘণ্টা ঝুলিয়ে ভোর বেলাই হাঁপাচ্ছে।

কৃষ্ণ ধর

জয় হে মানুষ, জয় হে

প্রাক্তনের কাছে কিছু স্মরণিত শব্দ ও চেতনা

প্রতিদিন খুঁজে নিতে চাই, নিঃস্বাসে প্রস্বাসে

আমারও প্রাক্তন ছিল, আজকের সময়ের ব্যবহার থেকে

ভিন্নতর চর্চা নিয়ে তারা আজ অতীতে শারিত।

এখন ক্ষুধার্ত হলে সেই সব সময়ের কুলুঙ্গি থেকে

পদাবলী চর্চার স্তনিশ্চয় আশ্বাদ ফিরে পাই

তাতেই সন্তোষ, তাতে হাজার বছর কালের

অবিনশ্বরতা প্রতিভাত হয়ে আছে।

মানুষের সময়ের সমাজের রোদ্রকণা খুঁটে খুঁটে
তুলে নিই, এভাবেই পার হই হৃদয়ের সাঁকো
সময়ের নদী ও সমুদ্র

প্রাক্তনের কাছে আমি ঋণী আমার ভাষা ও ভাবনা
আমার মগজ ঘুরেফিরে সেদিকেই সমর্পিত
এক পা এগিয়ে হু পা পেছাই সাবধানে পার হতে
দুর্গম কান্তার গিরি, মরুস্থলী, শব্দের সাগর।

যদিও অপূর্ণ থাকে সন্ততির দুধ ও ভাতের স্বপ্ন
আলতা পায়ে অন্নপূর্ণা চলে যান মজুমদার বাড়ি
জানেন একথা শুধু রাবণশুণাকর

প্রাক্তনের কাছে সেই সব ঋণ শোধ দিতে
প্রতিদিন কলম শানাই, শব্দ খুঁজি
ছন্দের সোপান বেয়ে যাই পদ্মাবলী উপত্যকায়
বলি, জয় হে কবিতা, জয় হে সময়কাল,
প্রাক্তন ও বর্তমান জয় হে মানুষ, জয় হে।

বিতোষ আচার্য

দুর্লভ

কলকাতা, কুলটা তুই ! সাবেকী সে বদরক্ত, শ্বেদ
আজো তোর শরীরে, শিরায়
—নেচে যাস যেন বা হস্তিনী
প্রশ্বেদে ভাসাস, কিন্তু সেই পুলক, কাঁপন ?
আজ স্বতি...
পিপাসায় ছাতি কেটে গেলে
আজো দেখি
জলপাত্রে গিজগিজ পোকায় সমানে উজার

—ভাঙ্গের গুমোট নেড়ে কচিং কখনো
 প্রসাধন-পটু নাগরী-গোড়মুড়া যেই
 ঢেউ তুলে হাঁটে
 হায় হায়, কী যে মত্ত দাপাদাপি বুকে
 টারারের ছাপ-মারা আরেক সড়ক এসে
 নিয়ে যার পেট্রলের ঝড়ে

সব জানি

—যতই কুলটা হোস, তুই তো জানি কারো কারো
 বুকের পাজর নিংড়ে, দুধ টেনে
 অবোধ শিশুর মতো অশঙ্ক শরীরে
 কী স্বস্তিতে তোরই কোলে তারা যে ঘুমায়
 মরি মরি, এই সমাহার
 দুর্লভ, দুর্লভ ॥

সিদ্ধেশ্বর সেন

পাথের কুড়োয় ছন্নমৃতি

নেই কোনোখানে পা ফেলারও, তবু
 প্রকৃতিস্বের ছন্দ,
 কোথায় হুঃহু পা

ফেলেছি,

নেই কোনোখানে—

পা-ফেলারও গতি, স্পন্দ !

অরণ্য হয়তো !

আলোর চলার, বাঁকারও গতিতে

গতির ভেদে

বঁকে-চুরে চলা ? এই-ই কী

স্বরগ—

আপেক্ষিকের শর্তে?

নগর,

বাড়াবে অসুন্দরের

স্বীতি—

একটি সবুজ কলি জাগাবে না, মেনে-ও

স্বতি !

ভেঙে—

অজস্র পাথর, থোরার শুইয়ে

পাঁজর

পাথের কুড়োতে পথেই নেমেছে

লিঅর

ছন্নশ্রুতি !!

মৃগাক্ষ রায়

আমার বাড়ি

কেউ নেই, এঘর ওঘর ঘুরে জাখো,

বাগান বা বারান্দা ঘুরে জাখো

—কেউ নেই। কুলুঙ্গিতে সিঁচুরের দাগ আছে,

দেয়ালে হরিণের মাথা, আছে পেতলের পঞ্চপ্রদীপ,

ভাঙা বাক্স, কাঠের খড়ম, পাথরের কলমদানী,

চোখ-আঁকা সিঁচুর-মাথান রামদা। তাছাড়া

দক্ষিণে গাছ ঘেরা মস্ত পুকুর, ছপুর্ন হলে

কলসিতে জল ভরার আওয়াজ,

মাঠের আকাশে ধূ ধূ করছে

তীরের ফলার মত একটা দুটো পাখী।

কেউ নেই, অথচ কেউ কেউ ছিল ।
 সন্ধ্যা হলে গোয়ালে গরুর গম্ভীর কাশি
 শোনা যেত, শিশুগাছের মগডালে
 জল জল করত লক্ষ্মীপ্যাচার চোখ ;
 কিছু মানুষ সারাদিন বসে বসে
 প্রাচীন গল্পের ছাঁচে
 সাদা কালো মানুষ বানাত ।
 আজ কেউ নেই, দূরে কাছে কেউ নেই—
 সাপের মুখে ব্যাঙের আর্তনাদের মত
 শুধু আমি আছি ॥

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

নিশ্চিন্ত খোয়াই

কাদের জন্তু আমি ছুটে এলাম
 রাক্ষসের হাঁ-এর মত এই শূন্য মাঠে !
 অথচ বৃষ্টির মেঘ আমাকে ডেকেছিল
 লাল মাটির পথের পাশে থড়ের চালায়
 কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছি ধারাবর্ষণে
 অকস্মাৎ বারাননার কটাক্ষের মত
 এক ঝলক রোদ
 আমাকে এখানে এনেছে, এই শূন্য মাঠে ।
 খোয়াই জুড়ে যে তালের সারি
 বর্ষার আকাশ মাথায় নিয়ে দাঁড়াত
 তাদের জন্তুই আমার ছুটে আসা
 ময়ূরাক্ষি ক্যানালের ধার ঘেঁষে
 সীণ্ডতাল মেয়েদের মত উজ্জল
 যে শাল আর সোনাবুরির অরণ্য
 তাদের জন্তুই ত আমি আজ এখানে ।

অথচ এখন খোয়াই-এর লাল বুকে
 যোনব্যাদির বৃত্তাকার ক্ষতের মত
 সারি সারি কাটা ভালগাছের গোড়া
 ভাঙনের কারিগরের হাতে
 জলধারার নিপুণ ছেনি
 কোথাও কোটাচ্ছে আটচালার আদল
 কোথাও বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুতুল
 অভিমানী হা হা দৃষ্টি ছুটে গিয়ে
 বিদ্ধ হচ্ছে প্রান্তিকের ডিস্ট্যান্ট সিংহালে
 সহসা মাঠ ফুঁড়ে কয়েকটা আলাদিনের প্রাসাদ :
 অবসর জীবনের সাংস্কৃতিক উদ্গার ।
 রামকিঙ্করের উলিঝুলি মাথার মত
 ছড়ানো ছিল যে সাইবাবলার নিসর্গ
 তার জায়গায় এপ্রান্ত ওপ্রান্ত
 বিজলী তারের খুঁটি ।

তবে কাদের জন্ত আমি এখানে ছুটে এলাম
 রাক্ষসের হাঁ-এর মত এই নিম্পত্র খোয়াই-এ !

মিহির ঘোষদস্তিদার
 আমাকে ক্ষমা করো

আমাকে ক্ষমা করো রবীন্দ্রনাথ
 তোমার এ-ই সব জন্মদিনে
 আমাকে ধেতে বলো না

এ-ই সেদিন যে লোকটা
 মেয়েদের শূলে চড়ানোর ব্যবস্থা নিল
 সে-ও দেখছি তোমার এই জন্মদিনের মিছিলে,
 যে লোকগুলোর কাছে মানুষের মূল্য নেই একেবারে

যাদের কাছে মাহুব পণ্যছাড়া আর কিছু নয়
বারা লোভের জন্তে, অর্থের জন্তে

মাহুব-মারার ব্যবসা কীদে

তারাপে দেখছি দিকি এসে গেছে
তোমার এই একশ' পঁচিশতম জন্মদিনে
কী চমৎকার এইসব জগতের বিশ্বভ্রাতৃত্ব !

কখনো-সখনো তোমার কথা মনে পড়লে

ভেসে ওঠে একটা মুখ

মাহুবের জন্তে যা কিছু ভালো

তাকে

বাঁচানোর তাগিদে

সব কিছু পণ করার ছিল যার ইচ্ছে

কাল থেকে আমি তোমার জন্তে সাজিয়ে রেখেছি

রক্তবর্ণ একগুচ্ছ কৃষ্ণচূড়া

ইচ্ছে হয়, যে মিছিলে আমি ইটিছি

তুমিও তোমার একশো পঁচিশ বছরের মুক্ত

অখচ

তেজোদৃপ্ত শরীরটা নিয়ে

আমার সঙ্গে অনাবাসে ইটিতে পারো

ইটিতে পারো অবিরাম

জীবনের যা কিছু ভালো

যা কিছু উজ্জল

তাকে ছিনিয়ে আনার জন্তে ॥

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

গাইড

এক একটা দিন এমনি করেই উঠে আসে—সকালবেলায়
 গৃহপালিতের ডাক—বেলা বাড়তে না বাড়তেই সকলের
 পারে ঝিলিক দিয়ে বেজে ওঠা মিহিকাজের সোনারূপোর
 শিকল—তালগোল পাকানো গতিটাও পথ না পেয়ে
 ছুঁ মারতে থাকে সবদিকে—বদিও ঝর্ণার পাশে পৌছানোর
 কোনো কথাই আমার ছিল না—তা বলে আগুনের তাপে
 সবগুলো হাড় ধলুকের মতো বেকে যাবে—আর শরীরটা
 জ্যামুক্ত হতে পারবে না কিছুতেই—হাউজিং থেকে বেরিয়ে
 আসা প্রজাপতিদের পারে ধাতব কোনো শব্দও বাজেনি—
 দু-একটা ফিসফাস শোনা গেলেও কে আর জানত উচ্চতা
 মানেই চিংকার—পাখির বাসার খোঁজ করলে চোখে পড়ে
 প্রতিমাহীন ডাকের সাজ—ঘোড়ার খুরের আগুয়াজে
 কিরে তাকালেই ঘূর্ণিঝড়ের ক্যাকক্যাকে হাসি—
 শুকনো পাতার হুল্লোড়—থুলোর ধোঁয়াকার—
 শূন্যকূন্ডের চেয়েও শূন্যতর আকাশের নিচে ছন্দও বসার
 ব্যর্থতা নেই—ঝর্ণার পাশেও নয়—উৎসের গভীরেও
 নয়—বেরোবার পথটুকুই বাৎসরে দেবার মতো
 ধারে কাছে গাইড নেই—কেউ-ই—একএকটা
 দিন এমনি করেই উঠে আসে...

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

সূর্য, স্বাধীনতা

নীতে

সারারাত শুনি

কুকুরের ডাক ।

আমি যে কবিতা লিখি

সে-কবিতার গিছনের কবি

মিশে থাকে সমস্ত আগুয়াজে ।

স্বপ্নের মাঠের থেকে
জ্যোৎস্নার ঠাণ্ডা ধুব্বু হ'রে আসে—
শিশিরের জলে ভেজা আমার কবির
অলুচায় শান্ত সেই আরোহণ জগতের কথা ।

শীতে

এই রাতে আর
কিছুই আসে না মনে—
অচেনা পাখির মতো শব্দ ছাড়া...
ঘাস আর পাথরের, পৃথিবীর উজ্জলতা ছাড়া
সারাদিন কাজের উত্তমে ক্লান্ত

মাছবের ঘুম ছাড়া...

অন্ত কিছু সেরকম আসেনাকো

মনে—

অন্ত কিছু—শুধু আজীবনে ।
আমার এ ভয়ঙ্কর শীতের ভিতরে
যেন সেই কবি শুধু গায়চারি করে
সারারাত অস্থির তিমিরে, কিংবা যেন স্বচ্ছতায়,
অশ্লীল স্বপ্নের মতো অমোঘ সকালে

অভিভূত রৌদ্রের সমাজে ।

এবার এ-মাঘরাতে

গভীর ঘুমেও তাই
খালি খালি ঘুরে যায়
স্বংকাতর মাছবের মতো একা ভাঙা
ঘেরো, স্তম্ভ, বিচ্ছিন্ন স্বপ্ন এক
কুকুরের ডাক ।

শীতে

সারারাত সেই কুকুরের ডাক
কেড়ে নেব—

ঘুম, স্বাধীনতা ।

তরুণ সাংস্কার

পাহাড়ের ঘাড়ে একাকী

পাহাড়ের ঘাড়ে একাকী দীঘল বার্চের কাণ্ড উঠে যায় আকাশ আকুল,
 পাশে কাকে সঙ্গী করবে, নিঃসঙ্গ একান্ত একা, এমনি কি জীবন ?
 সে জীবনে বাঁচা বড় শক্ত, শুধু বিরোধী হাওয়ার সঙ্গে টক্কর বাজিয়ে ।
 ঢাক নেই, ডকা নেই, সভা অস্ত্রশস্ত্র নেই, যা আছে সে শুধুই কলম
 এবং প্রবল গ্রীষ্মে খোলা গা হাওয়ায় খুশি, শীতে হাঙ্কা তুষ,
 কিংবা দোলাইয়ের সঙ্গী ভুবন ডাঙ্গায় কিছু কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ ।
 তাঁকে শ্রদ্ধা করা যায়, দূর থেকে প্রশংসা জানানো যায়, বা ঈর্ষাও বৃদ্ধি,
 তবু আসে যায় না কিছু, না কিছুই আসে যায় না, তিনি তো কাছেও থেকে দূরই
 পায়ের পাপড়ির চাপা ছুঁয়ে বসেছে একাধিক সেদিনের অলোকসন্মরী
 বৃদ্ধি তিনি সেই সব বুক-মুখ-শ্রোণী থেকে চোখ তুলে শাল বীথিকায়
 ঘন নীলাঙ্গন রেখা দেখেছিলেন, গর্জমান, ভক্তি এসে হাত জোড় দাঁড়িয়েছিল, আর
 যাকেউ বুঝত না তাও কাগজ-কলম-রঙে রক্ত মাংস ছেঁচে এঁকেছিলেন,
 এবং হিম্পানি নীলে বোমারুর চক্রে আরেকবার স্পষ্ট করে দেখেছিলেন ঘৃণা
 আর তিনি দীঘল বার্চের মত বামন গুল্মের মধ্যে হাত বাড়িয়ে ধরলেন সূর্যকে
 সদর স্ট্রীটের সেই বারান্দার বাইরে রাস্তা, সাজানপূরে সেই টেটবুর্ খাল
 মানুষে ও মানুষের সৃষ্টি দুই-ই মিলিয়ে অবাক করা মহামানবের জন্ম দেখে
 আমাদের জন্তে রেখে যান সেই আকাশের দিকে হাত বাড়ানো ইচ্ছাকে, যার নাম
 বড়ই দুঃখের মধ্যে, যন্ত্রণায় ও আনন্দে, যা অনাবিল্লত এক মহাদেশ অর্থাৎ জীবন ॥

বীরেন্দ্রনাথ সরকার

দুঃখের মহত্ত্ব

শোকের ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে অনেকে
 মাঠ পার হয়ে গেল ।

মহাস্তরের সারাহ বেলায় দু'একজন

প্রভাতের মাটিতে বীজ পুতে গেল

গ্রামের শেষ সীমানায়

আগামী প্রজন্মের জন্ত ।

আমি—

একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে দেখলাম
দারিদ্রের শোক-বাতায়
দুঃখের মহাব !

শঙ্খ ঘোষ

অন্ধবিলাপ

ধৃতরাষ্ট্র বললেন :

ধর্মক্ষেত্রে যুগক্ষেত্রে সমবেত লোকজনেরা
সবাই মিলে কী করল তা বলো আমার হে সঞ্জয়

অন্ধ আমি, দেখতে পাই না, আমিই তবু রাজ্যশিরে
কাজেই কোথায় কী ঘটছে তা সবই আমার জানতে হবে

সবই আমার বুঝতে হবে কার হাতে কোন্ অস্ত্র মজুত
কিংবা কে কোন্ লড়াইধাঁচে আড়াল থেকে ঘাপ্টি মারে

অন্ধ আমি, দেখতে পাই না, আমিই তবু রাজ্যশিরে
এবং লোকে বলে এ দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরে

কারা এসব রটিয়ে বেড়ায় বলো আমার হে সঞ্জয়
অন্ধ আমি, কিন্তু তবু এসব আমার জানতে হবে

তেমন-তেমন তথ্য করলে বাঁচবে না একজন্য পিঠও
জানিয়ে দিয়ো খুবই শক্ত বন্ধাতে এই রাষ্ট্র ধৃত

অসম্ভবের কুলায় আমার পালক দিয়ে বুলিয়ে যাবে
সেই আশাতে বর বাঁধিনি, দুর্হোধনরা তৈরি আছে

এবং বত বৈরী আছে, তাদের মগজ চিবিষে থাকে
খাচ্ছে কি না সেই কথাটা জানাও আমার হে সঞ্জয়

সামান্য এক ছটাক আমি ছাড়বে কেন আমার ছেলে
আবার সঙ্গে তুমিসেনা আমার সঙ্গে কুসুমীরা

আমার সঙ্গে ঘ্রোণ বা কুপ আমার সঙ্গে ভীষ্ম বিহ্বল
সেদিক থেকে দেখতে গেলে ধর্মরাজ্য এমন কী দূর

ছুটে বলে, মনে মনে তারা আমার কেউ না কি নয়
সেটাও যদি সত্যি হয় তো একাই একশো আমার ছেলে

তারা ই জানে শমনদমন ধ্বংস দিনে ধ্বংস রাতে
ছড়িয়ে যাবে ঘটল যা সব আরওস্বালে কানসারিতে

যে বা করে তাকে তো তার নিশ্চিত ফল ভুগতে হবে
কোথায় যাবে পালিয়ে, দেখো সামনে আমার সৈন্তবৃহ

তিনদিকে তিন দেয়াল ঘেরা সাতার রাউণ্ড গাছীমাঠে
ভিজল মাটি ভিজল মাটি ভিজুক মাটি রক্তপাতে

অর্থ ? কে ধর্ম মানে ? আমার ধর্ম শত্রুনাশন
নিরস্ত্রকে মারব না তা সবসময় কি মানতে পারি ?

মারব না কি নিভূঁমিকে ? নিরস্ত্রকে ? নিরস্ত্রকে ?
অবশ্য কেউ মেরেছিল সেটাই বা কে প্রমাণ করে !

এখন আমার মনে পড়ে বেদব্যাস যা বলেছিলেন
সৈন্তে শত্রু ছুঁড়েছে তা নয়—কোষ থেকে তা আগ্নি ছোটে

মাঝে মাঝেই ছুটবে এমন—ব্যাস তো জানেন আমার দশা
এই যে আমার একশো ছেলে—কেউ বশে নয় এরা আমার

এইরকমই অন্ধ আমি, আমিই তবু রাজ্যশিরে
—কিন্তু কারা শপথ নিল নিজেরই স্বপ্নিও ছিঁড়ে ?

ধানজমিতে খালজমিতে সমবেত লোকজনের
যেয়ে আসছে সামন্তদের—কেন এ দুঃস্বপ্ন দেখি ?

পূব থেকে পশ্চিমের থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে কে
অকোঁহিলী বিরবে বলে কন্দি করে আসছে কোঁপে ?

লোহার বর্মে সাজিয়ে রাশি কেউ যেন না জাপটে ধরে
স্বপ্নে তবু এগিয়ে আসে নারচ ভল্ল খড়া তোমর—

এখন আমার মনে পড়ে বেদব্যাস যা বলেছিলেন
নিদেনকালে সমস্ত দিক নাশকচিহ্নে ছড়িয়ে যাবে

সন্ধ্যাকাশে দুই পাশে দুই শাদা লালের প্রান্ত নিয়ে
রুম্বগ্রীব মেঘ ঘুরবে বিদ্যাকামমণ্ডিত

বাজশকুনে হাড়গিলেতে ভরবে উচু গাছের চূড়ো
তাকিয়ে থাকবে লোহার ঠোঁটে খুবলে ধাবে মাংস কখন

মেঘ বরাবে ধুলো, মেঘেই মাংসকণা বরিয়ে দেবে
হাতির পিঠে লাফিয়ে যাবে বেলে ইঁস আর হাজার ফড়িং
কাজেই বলা, হে সঞ্জয়, কোন্ দিকে কার পাল্লা ভারি ?
জিতব ? না কি নিদেনকালের জাঁতার পিবে মরব এবার ?

সর্বনাশে সমুৎপন্ন অর্ধেক কি ছাড়তে হবে ?
টুকরো টুকরো করব কি দেশ পিছিয়ে গিয়ে সগৌরবে ?

যে বাই বলুক, এটাই ঞ্জব—আমার দিকেই ভিড়ছে যুব
তবুও শুধু ব্যাস যা বলেন সেটাই কি সব ফলবে তবে ?

কলুক, তবু শেষ দেখে বাই, জ্বাংটার নেই বাটপাড়ে ভর
ইজিতে-বা বলছে লোকে আমার না কি মরণদশা

বাজশকুনে হাড়গিলেতে তাকিয়ে আছে লোহার ঠোঁটে—
ধানজমিতে খাসজমিতে জমছে লোকে কোন্ শপথে

কিসের ধনি জাগার ঘুরে দিকে এবং দিগন্তরে
দেবদত্ত পাকজন্ত মনিপুশক পোঁও হুঘোষ

শেষের সে রোষ ভয়ংকরী সেই কথাটা বুঝতে পারি
কিন্তু তবু অন্ধ আমি, ব্যাসকে তো তা বলেইছিলাম

বলেছিলাম এটাই গতি, ভবিষ্যৎ এটাই আমার
আমার পাপেই উশকে উঠবে হয়তো-বা সব খেত বা ধামার

উশকে উঠুক উশকে উঠুক মহেখরের প্রলয়দিনাক
সর্বনাশের সীমায় সবাই যায় যদি তো শেষ হয়ে থাক

কোন্ খেতে বা কোন্ ধামারে সমবেত লোকজনেরা
জমছে এসে শঙ্কপাণি বলে আমায় হে সঞ্জয়

সমবেত লোকজনেরা কোথায় কখন কী করছে তা
শোনাও আমায়, অন্ধ আমি, শোনাও আমায় হে সঞ্জয়

শোনাও আমায়, শোনাও আমায় শেষের সেদিন হে সঞ্জয় !

সুনীলকুমার নন্দী

দুঃখের শরিক

কী তুমি জেনেছ ? এই

ফুল, মালী, কোলাহল, উৎসবের রঙ

দেখে তাকে যা ভেবেছ তাই সব নয় ।

দুইয়ে-দুইয়ে চার হওয়া অঙ্কের নিয়মে

তুমি

বাড়িঘর এমন কি তার চুল থেকে পদতল

সমস্ত শরীর

আতিপাতি যতই খোঁজ না কেন,

পেরেছ কি ছুঁতে তার বৃকের গভীর, বৃক

বে কিনা রেখেছে ধরে

উড়ে-বাওয়া নীল পাখি, ব্যথাময় স্মৃতি, অন্ধকার ?

পারবে না, পারে না কেউ

না-জাগালে সুখ-দুঃখ অকুণ্ঠবে

রক্তের পরাণকথা, অস্পূর্ণ যে-দাহ—

তা না-হলে

শিরা-উপশিরা ছেঁড়া হৃৎকের শরিক

হতে গিয়ে

ভুলশ্রোতে পাড়ি তোলা ; ভুলশ্রোতে পাড়ি তুলে

কে কার হৃৎকের ভার তুলে নিতে পারে !

সুনীল হাজরা

স্বপ্নের কেতন

এতো আলো চাই না জীবনে,

কিছু অন্ধকার থাক,

থেকে যাক বুকের ভিতর ।

নিজস্ব ব্যর্থতাগুলি

মাঝে মাঝে পীড়া দিক মনে,

না-হলে কেমন আছি

না তাকিয়ে পিছনের দিকে

বলবো কেমনে !

সকলেই তৃপ্ত থাকে

নিজস্ব নিয়মে ।

যদিও পিছনে

অনেক অনেক পথ

ইচ্ছার আগুনে

পুড়ে গেছে ।

তবুও এখনো তার মনে

অসংখ্য উজ্জ্বল তারাগুলি

ছুঁতে চায় চিন্তার মাটি,

পথটা অগম্য বুঝি
 বুঝি তার জীবনটাই যেহি !
 হতে পারে...
 কী জানি কখন
 আলো অন্ধকার হোঁর
 জীবন কী স্বপ্নের কেতন ।

মকীন্দ্র ঘটক
 হবি তো হ

তোর ইচ্ছে
 বা চাস বা খুশি
 কর বা ধর এক মুঠ
 গুচ্ছ গুণ্য সুগন্ধ ওষধি
 বিশাল্যকরণী
 তোর ইচ্ছে ।
 হবি তো হ
 একলব্য, নয় হনুমান ॥

তুচ্ছের বিনিময়ে

যদি যাই সমুদ্রের কাছে
 একটা বটপাতার অভাব থেকেই যাবে ।
 পাবো না কোথাও ভাসিয়ে দেবার মতো
 তুচ্ছ এক বটপাতা
 তাই নিজেই ভাসাতে হয়
 তুচ্ছের বিনিময়ে কেবল নিজেই ॥

শ্রীমঙ্গল দে

মিনার

পোশাকে রক্তের ছাপ,
খুনের প্রতিবিম্ব
হাতের আঙুলের নোখে ।

তুমার ঢাকা হিমালয়ের রূপালী ছায়া থেকে
পাঞ্জাব দিল্লী আসাম হয়ে
আহমেদাবাদ,
কী বিপুল আমার পদ সঞ্চালন !
সব জায়গায় আমি ছড়িয়ে দিই
আমার মন্ত্র
হিংসা-সার যুগের তুলিতে ঐক্য
খুনের কী অপূর্ব ছবি ।

আমি তো খুন করেছি সেই পাখিকে—
ভোরের নরম রোদে মাথার উপর উড়তে উড়তে বলেছিল
দিন শেষে সন্ধ্যায় ফিরে আসব
আমার ভালোবাসার বাসায় ।
আমি তো হুই হাতে ছিঁড়ে দলেছি
গাছের সেই কুঁড়িগুলো
বার ফুলের স্বপ্নভিতে মৌমাছি আসত—
ভরাত মধুর ভাণ্ডার ।
আমি প্রচণ্ড ধমকে ছেলেটার মুখের হাসি মুছেছি
সেখানে এঁকেছি এক ভয় আর জিহ্বাসার ছবি ।

পর্বতশিখর থেকে অন্তরীপে
আমি সৃষ্টি করি এক এক হত্যার দ্বীপ,
যেখানে নিবেধ ফুল কোটা,
নিবেধ পাখির গান গাওয়া,
নিবেধ ভালবাসার স্বপ্ন ।

অথচ আকাশ আড়াল করা মেঘ
 সেখান থেকে ভেসে আসে অসংখ্য পাখির গান
 বাতাস বয়ে আনে বনফুলের গন্ধ
 মৌমাছি ছুটে যায় মধু ভরাতে ।
 আমি কি পরাজিত !

বনানীর পাতায় পাতায় তীব্র নির্দেশ
 মুছে নাও চোখ থেকে খুনের ছায়া
 আঁকো ভালোবাসার স্বপ্ন
 যেখানে খুনের সমাধিতে উঠবে
 গঠনের গর্বিত মিনার ।

রবীন সুর

দীক্ষা নিতে হবে

ছ' হাজার বর্ষব্যাপী আমাদের কৃষিসভ্যতার
 মতো কিছু মণিমুক্তা, ছেঁড়া-কাঁথা-মোড়া ।
 অধীত বিজ্ঞান শিক্ষা যতটুকু, তার চেয়ে বেশি
 অভিজ্ঞতা উৎসারিত বইহীন গ্রামীণ মননে :
 নোহুঁমী মেঘের ঢল, ঘন বৃষ্টি মাটির উল্লাসে
 বীজতলার ছোট চারা জো-আসা খেতের দিগ্বিদিকে
 সবুজ স্বপ্নের চেউ, ঘন দুধ জমে ঝাঁ বীজের ভিতর,
 লাঙলে পেশির ঘাম হেমন্তের সোনালী খামারে
 নবান্ন উৎসব । শস্য, মেটে রাস্তা বেয়ে বরাবর
 ফিরে আসে আতরের গন্ধমাখা যোগ্য পুরস্কারে ।

কুমোরের চাকা ঘোরে । মাটি-পোড়া তৈজস, পুতুল
 জাগ্রত তাঁতের মাকু, শোলা রাংতা, শারদ প্রতিমা—
 শাদামেঘ ঘন কাশ কাকচক্ষু নিশ্চিন্ত পুকুরে
 নিব্বত বুড়বুড়ি ওঠা ঝাঁক ঝাঁক মাছের সংসার ।

দেবতা মন্দিরে নেই, ভূমণ্ডলে সবার ওপরে
মামুষকে রেখেছে কবি। শ্রেষ্ঠ প্রেম দিতে পারে রাঘী
যদি তার মধ্যে থাকে চিরন্তন কাব্যের রমণী।

আছে হুংখ, আছে মৃত্যু, মহাজনী স্বদের তাগাদা,
পাশাপাশি সহদয় তেঁতুলপাতার সৃজন ন'জন,
মস্ত্র নয় তন্ত্র নয়, অলৌকিক জড়ি বুটি কোনো কিছুতেই
ঋব মান, আর হুঁশ মুছে দিতে এখনও পারেনি।

যা নেই তাকিক ঘন্টে টিকি যতো নড়ে, সরাসরি মানবিক
পুরনো গয়নাগুলি খাদহীন, লোক-গাথা বাউল গানের
মরমী বাণীর ছোঁয়া, চৌটে-গাথা বাবুই বাসার
শিল্পীত ঘরের মধ্যে আলো জ্বালে জীবন্ত জোনাকী।

জ্ঞানহীন বিজ্ঞানের লংকা-দর্প, দৃষ্টি নেই কুট দর্শনের
সমস্ত তবের খড় ঢেকে দিতে মাটি চাই, পটুয়া মনের
তুলিতে অর্জিত স্বপ্ন ইন্দ্রধনু প্রতিমাকে গর্জন তেলের
পৌচে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জলজ্যাস্ত প্রতিক্রিয়া দিতে পারে রামচন্দ্র শুধু,
মাটিতে শেকড় আছে পরিশ্রুত বক্যস্ত্রে অকালবোধন।

বাদল ভট্টাচার্য

আমার হৃদয় জুড়ে

আমার হৃদয় জুড়ে সারাক্ষণ বৃষ্টি হয়
সারাবেলা ছায়াচ্ছন্ন বনের নিবীড় ;
শক্তি জলের জ্ঞান হ্রস্ব পিপাসা
ক্রমশ ভেতর ভাঙ্গে, আনন্দ অধীর।

পৃথিবী পুড়েছে ঢের চৈত্রের চিত্রায়
পুড়েছে পবিত্র প্রেম আকাশ মাজি ;
হুংখের দর্পণে তবু দৃষ্টি অবকাশে
আঁকা থাকে ভিন্ন ছবি সপ্রসঙ্গ পাতায়।

সবুজ সারিধ্যে এসে সব হুঃখ শেষ হয়
 শুক্ক হয় জীবনের সমস্ত সংঘাত ;
 পবিত্র পতনক্ষণি ছিন্ন করে নষ্ট ঋতু
 শতকে সমুদ্র করে এড়িয়ে আঘাত ।

আমার হৃদয় জুড়ে সারাক্ষণ বৃষ্টি হয়
 সারাবেলা ছায়াচ্ছন্ন বনের নিবীড় ;
 অবিরাম মগ্ন হুঃখ গভীর আগ্নেয়ে
 ক্রমশ ভেতর ভালে, আচ্ছন্ন অগ্নির ।

শিবশঙ্কু পাল দুর্গেশনন্দিনী

ঘরের মধ্যে দুর্গ দুর্গদ্বারে পরিধা
 সহস্রাঙ্গ প্রহরীর ছিল আত্মগত্যের তরিকা ।
 পশ্চিমার ধারে কবে হেসেছিল ষেতকরবী
 সেই একবার বলিভুক হতে তুলে গিয়েছিল পরভুৎ ।
 নষ্ট চাঁদের নীচে জোয়ারের সমারোহ
 মধ্যরাতের পরিকাঠামোর হঠাৎ রাজদ্রোহ ।
 অগ্নিকাণ্ড লুণ্ঠন দিশেহারা অনীকিনী
 কখন কোথায় খালি পায়ে হাঁটে দুর্গেশনন্দিনী ।

অমিতাভ দাশগুপ্ত কর্ণ

ও নদী, তুমি সমুদ্রকে আমার কথা বোলো ।
 ভোমার জলে মিশিয়ে দিলাম হুঁল নীরবতার
 কষ্ট, দিলাম বুকের থেকে জমাট-বাঁধা হুড়ি,
 মরা গাছের হলুদ পাতা, বসন্ত বাড়ির মাটি—
 নদী, তুমি সমুদ্রকে আমার কথা বোলো ।

হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যাবেলায় তোমার সঙ্গে দেখা ।
 হু পায়ে এত ক্লান্তি, তাই ভাগতে চেয়েছিলাম,
 তোমাকে দেখে হাওয়ার হাতে বিছিরে দিয়ে শরীর
 বলেছি—নাও, কর্ণ আমি, আমাকে নিয়ে বাও
 গোসানি গাঁয়ে, যেখানে একা জাগেন অধিরথ,
 তাঁর ধরনী রাধার কোলে আমার কাঁধা পাতো ।

এখন আমার রথের চাকা আহার মেদিনীর ।
 ছিন্ন ধ্বজ, কাটা শালের কাণ্ড ছুটি ভুজ ।
 সূর্য-সনাথ-কপালে দীপ্ত শশান-শেরালের,
 কুন্তী ভাঞ্জন তারার আলোর আত্মজের মুখ ।

আমাকে ধোঁজে গোসানি গাঁয়ে বৃদ্ধ অধিরথ
 এবং মাতা রাধার চারচোখের ঘন তিমির ।
 হাওয়ার হাতে কালের হাতে ভাসিয়ে পরিণাম
 সঁপেছি সব তোমাকে, তুমি মিলিয়ে যেতে যেতে
 ও নদী, ভরা সমুদ্রকে আমার কথা বোলো ॥

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রত্যাবর্তন

দেশবিবেচনার দিন শেষ, এবার কি ঝর্নার আলোচনা ।
 বারী মালুবের সর্বনাম, তাপ-শীত নিরুক্তিত নৈরাজ্যসভার শুধু বচনকবির
 দৈনিক হুঃসংবারণপত্রের তারাইতো বিবরাশর,
 প্রতি জাগরণবেলা করে ভোলে লোনা
 ছল্লাপ ছবিতে ছবিতে হার সকালের সূর্যও অস্থির ।

যে ভাঙন শুরু সেই সন-চন্দ্ৰিশ-সাতে
 নতুন টুকরোর ত্রাণে সে কি কোনো সংক্রান্তি সাজাবে । এক হাতে
 সাহেবগৃহ অস্ত্র হাতে কুটিল ট্রিগার, রক্ত বেন বৃষ্টিরও কনিষ্ঠ
 অবিরল স্বরে আর স্বাধীনতা রোগা হয় ; চোখে বা নির্দিষ্ট

সেই শোচনাসলিল আজ বিবেকের ঠিকানা ভুলেছে, ক্রন্দন
 যেন না-ঝরা চাবীর মেঘ বসন্ত বিদেশী !
 উনত্রিশ বছর তবে বড় বেশি আশা করে গেছি
 প্রতিবাদের আয়ু স্নায়ুকে করেছে আজ স্থায়ী প্রত্যর্শা,
 একটি অক্ষরও আমি পৌঁছে দিতে পারিনি পারবো না
 ঐ সব জনতাচর্চায় মগ্ন ভাষণপ্রধান কন্ঠটিতে,
 আমাদের নেই ঋষি-আয়ু, যার উপনিষদীয় সংবিতে
 স্বাধীনতাকে আজও বলা যায় এক হাঁটি হাঁটি পা পা টহলবালক
 যে নাকি ভুলেছে ধুলো, জানে না যে ফুলের কোনটি কুরুবক !
 হে কুহক ! হে জনগণনির্বাচিত বছর বছর ধাক্কা, মানচিত্র-স্বদেশ
 ভাষার আশায় ভাসিয়ে কখনো আর রাখবো না তোমাকে !
 রোজ নূর্য একলাই ওঠে, অন্ধকারই দল গড়ে, নিশিডাকে ডাকে
 আমি চিং ও আকাশমুখো শুয়ে মৃত্যু অভ্যাস করি, স্পষ্ট
 বুঝি হে দেশ তোমার জন্ত, কবিতাকে এতদিন কিভাবে করেছি নষ্ট,
 আজ তাই ফেরাতে চাই বর্নার ঝংকার, শিশির সরিয়ে ওড়া আশ্বিন পাখি,
 সম্বল শিউলিকে বুকে চেপে চোখ বুজে থাকি ।

কীটপতঙ্গের জন্ত ফোটা ফুল মানুষ একদা ভুল ভালবেসেছিল বলেই
 ফুল কবিতায় আশানসাহসী হয়েছিল, সেই
 কুসুমসমাপ্ত ছাই দুহাতে সরাই
 আর “আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই
 মরি”—আমোদগাড়ল হয়ে গলা ছেড়ে গাই ।

রত্নেশ্বর হাজরা

তবে

বাড়িয়ে দিয়েছে হাত ঠিকই, তবে সেই হাতে
 ইম্পাতের খোলস এখন
 বাড়িয়ে দিয়েছে কান ঠিকই, তবে সেই কানও
 এখন বধির

ছ'চোখ তাকিয়ে আছে তোমার দিকেই, তবে
সেই চোখ স্বেচ্ছা-অন্ধত্বের
মুখে যে-হাসিটি লেগে আছে—তারও
একাধিক অর্থ করা যায়
ভিতরে যে ডেকে নিয়ে এলো—সে-ই পিছে
বাঘনখ আত্তিনে লুকিয়ে
কারো ইজিতের অপেক্ষায়।

যা কিছু বলার ইচ্ছা—সবই
বলে ফেলতে পারো, কিন্তু বলে
পালাবে কোথায়।

দীপেন রায়

১৩৯৩

১

উত্তর থেকে দক্ষিণ গঙ্গার সমস্ত জল আমি পেতে চাই
আমার গণ্ডবে
পাথর হুড়ির চেয়ে গোটা হিমালয় আমার না-হলে চলে না
শুধু শরীর নিয়ে কে কোথায় গিয়েছে উৎসবে
আমি চাই তোমার মনও।

তুমি টুকরো করো আমি জুড়ে যাই অরণ্যভুবন
তুমি ছিন্ন করো আমি গঁথে যাই মাটি ও জলকে
এ না-হলে আমার চলে না
আমি শুধু পেতে চাই আকাশের সবটুকু নীল
আমি চাই তোমার মনও।

২

হুলতে থাকে বুকের ভিতর অন্ধ আলোর আবেগটুকু
একলাবিকেল, নেহাৎ তুমি কুড়িয়ে নিলে আঁচল ভরে,

পাথের তলায় নাড়া-বাদা, স্বপ্ন মেখে দাঁড়িয়ে আছি,
ছিন্নমুণ্ড ধরাশায়ী, সোমেধরী ও-বালুচর
টংকনারী বুলেট বিদ্ধ, মনে আছে রাসমণিকে ।

কোথায় এলাম ভুলতে ভুলতে কোমর-ডোবা-জলা-পুকুর
স্মৃতির পাতা উন্টে-পাণ্টে ফিস্ফিসানি বয়স বাড়ে
ভাসতে ভাসতে এপার-ওপার তিজেল হাড়ি, সবটুকু স্থখ
মুড়িয়ে গেল নটেস্বদ্ধ ঘাটের পানি হাওয়ার ভেসে—
একলা আমি ধূসর স্মৃতি দাঁড়িয়ে পড়ি আচম্বিতে ॥

নীরেন্দ্র হাজরা

এক গেলাস তৃষ্ণা

এক গেলাস তৃষ্ণা ছিলো বুকের ভিতর

মাহুষ দেয়নি জল, মাহুষ দেয়নি
সাড়া,..., পাশে কানা নদী ছিলো
ছল্ ছল্ । শ্মশান চিতায়
জলে যায় অহরহ আমাদের লাশ...

এক গেলাস তৃষ্ণা নিয়ে আমার এভাবে ঘরে ফেরা
এভাবে জীবন, এভাবে ইশারা
জোয়ারের জলে যেন অদ্ভুত তামাসা...

এ শ্মশানে কে আছেন ? অনন্ত মর্মস্ব—

আমি ছাড়া, কোন ছায়া নেই
কাস্তা নেই—, কবি নেই
আছেন চণ্ডাল যেন আগলে আমাকে...

এই দ্যাখো আমাদের লাশ কৌচড়ে পুরেছি

পরস্পর—, ফুল নয়, মৃত্যু নয়
হু'চোখে পাতার ছায়া
একটু আশ্রয়...

সন্তোষ চক্রবর্তী

গুরুপঙ্কের জ্যোৎস্না

এখন গুরুপঙ্ক, অতএব তোমার মেথলা
সজীব ।

মনের বতন লোকজন এতোদিন
এবড়োখেবড়ো অঙ্ককারে চৈচামেটির পর
আষ্টেপৃষ্ঠে খুব
রথের চাকার মতো ঘুরছে ।
কখনো শিশু-ধ্বনি কখনো কাড়ানাকাড়া ।

যেন পরব ।
আকাশখানা চৌচির করে ফেলে
পালকের গায়ে রঙ ।

এখন বুধে পা, অতএব তোমার গালিচা
বিছানো ।
মামুষজন তো ঠিক ঈশ্বরের মতো
যার নামে
হলক নিতে হয় ।
তারপর নিজের সাক্ষ্য, নিজের সংসার ।

নৌকোর শস্য উঠছে, আর
নতুন কয়েকটির গলায় তোমার সেই
পুরাতনী গান ।

এখন অপলক জ্যোৎস্নার মাঝেমধ্যে কাক
ডেকে ওঠে ।

কমলেশ সেন

আমি জানি না

এখানে জীবন পাতা-ঝরা গাছের মতো।

তবু মাতুষ দখল নিতে চায়

বাপ-দাদার চাব করা জমির ওপর।

জমি যে কি জিনিস

তা জমি থেকে উৎখাত চাষীরাই জানে।

একফালি জমির জন্তে

জান কবুল-করা

কোন চাষীর কাছেই তেমন কোন ব্যাপার নয়।

চোখের ওপর তো

সামস্ত প্রভুর কোন অধিকার নেই।

এক মুঠো ভাত

বা এক ফালি জমিই তো

চাষীর সত্যিকারের জীবন।

আমি জানি না

জীবন বলতে কবিরা কি বোঝে !

কাব্যের ভাষা,

না, জমির ওপর নিঃশর্ত অধিকার !

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

২৫শে বৈশাখ ১৩৯৩

কীভাবে আরম্ভ হবে আমি তা জানি না।

গলা পিচ লরির চাকায়

ছড়ায় রাস্তার দুইদিকে —

এ অঞ্চলে মন্দারমালিকা নেই, নাচে না অঙ্গুরা,

পরাভিক নেই, চড়ুই বা শালিকও নেই—

গগনে আগুন আর নিচে

ধররাতি থরা

ঠাণ্ডা ভাতের মত বেলকুঁড়ি দ্বারের আকাশে ।

এক হাতে লাল গোলাপ অন্য হাতে জুয়া—

বরণ্যকে অরণ্যে পাঠাও,

স্পষ্ট হোক অন্ধত্ব, অন্ধরা ।

মূল দ্বন্দ্ব আড়ালে লুকিয়ে

চুল খুলে শোও কাছাকাছি,

তুমি ভাবো আর কারো কথা

দ্বিবি ঘুমে অন্তলোকে আছি ।

যায় দিন মেধাবী ঘর্ষণে,

সঙ্ক্যা আসে অদূর দর্শনে ।

উদ্ভূত মূল্যের মদে স্রষ্টি করি অপূর্ণ পরমা,

তোমার বিকীর্ণ জন্মদিনে—

পাপীকেও করে দাও ক্ষমা,

তবু যেন কিছু থাকে বাকি—

চতুর্দিকে আক্রান্ত বৈশাখী ।

তুমি আমি মিলে হবো এক,

এক থেকে সংক্রামক প্রচণ্ড শতেক,

দেখে যাবো ঘাসে ও আগুনে অভ্যুদয়ে

বাজে কিনা নিখিলের বিদ্রোহের বীণা—

কীভাবে যে শেষ হবে শেষ

আমি তা জানি না ।

শুভাশিস্ গোস্বামী

শীতের সাপের মতো

শীতের সাপের মতো পড়ে আছে খড়ের আরামে,

মাঝে মাঝে খোঁচা খেলে নড়ে-চড়ে ওঠে ।

তবে এই হিমঘুম চেয়েছিলে নাকি ?

ভিতর-বাহির জুড়ে, এরই জন্তে তবে এত রক্তক্ষরণ ?

বাতাসে মিশেছে কত বিবাদ ও প্রতিবাদ,

অশ্রু ও শপথ,

লোনা স্বামি ঝরেছে মাটিতে ।

সে সব এখন যেন অগ্নির মতন মনে হয় ।

চেয়ে দেখ গোখলিসন্ধির আলো নিভে এলো,

গড়িয়ে পড়ছে এক কঠিন ধাতব অঙ্ককার,

সেই অঙ্ককার নিয়ে লোকালুফি করবে যারা, তারা

ঠিক ঠিক জায়গায় ওত্ পেতে আছে ।

এসব তোমরা আজ বুঝেও বোঝ না,

তোমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে শুধু

ক্যানিউট-স্তাবকের দল ।

তবল শীতল চেউ আছেড়ে এসে পড়ে যদি পারে,

তখন চেতনা হবে ? নাকি কালঘুমে

ক্রমশ তলিয়ে যাওয়া

আর শুধু মৃত্যুর আরতি ?

আনন্দ ঘোষ হাজারা

গতানুগতিক

আন্দোলন থেমে গেছে হাওয়ার উষ্মে নেই আর ।

বেন বা প্রগাঢ় স্থিতি, জাভ্যন, স্বাভাবিক ভয়

অথবা স্নানর ক্লাস্তি দীর্ঘল বিকৃত হয়ে রোদ্রে রোদ্রে ঘোরে ;

পাখুরে সময় বেন তুপাকার করে রাখে

পাহাড়ের যত অবসাদ —

আন্দোলন ধেরে গেছে ; যেন জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ

নঞার্থে ঢেকেছে গ্রাম, মাঠ, নদী, মাটি ও ফসল ।

রামপদ জেল খেটে ফিরে আসে, ফের খুঁজে পায় ভাঙা-ঘর

তৈলবিহীন কুপি, সলতে নেই, ছিন্ন মাদুর

কীর্তনমুখর গোবা ভেঙে পড়ে আছে এক কোণে

বৌ খুব আনন্দিত ডোবা থেকে তুলে আনে

এক তালপাতা ভর্তি অজস্র শামুক

মাদুর ফিরেছে ঘরে হাওড়ার উদ্বেগ নেই আর...

সবই ঠিকঠাক আছে, রামপদ লোহারের তীব্র শীর্ণ চোখ

সুধু তাখে শুকনো শাল, বরাপাতা, অন্তরাগ, রোদ... ..

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

পাগলারোয়ার গতিপথে

মৃতদেহের আড়ালে যে আত্মগোপন করেছে

তাকে বোলো

তার ডাক শোনার ক্ষমতা

আমি অপেক্ষা করে আছি ।

দেহটা মৃত হলেও মনটা তো মরে না ।

পাগলারোয়ার গতিপথে তাই চিরকাল

এক আশ্চর্য মদন ধ্বনি ।

জল জমে জমে পাথর

নীৰবতার মধ্যে জমাট

অজস্র কথা ।

মৃত্যু বেন প্রশান্তির

ধ্যান মৌন গাভীর মন্থতা ।

তাই স্বত্বের আড়ালে যে লুকিয়ে পড়েছে
তার দিকে
আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি—

জানি
সে একবার নিশ্চয়ই আমাকে ডাকবে ।

উত্থানপদ বিজলী
দুঃখ নয় দুঃখ নয়
বটের ঝুরির মতো
নেমে আসে চিন্তাগুলো যতো,
দুঃখ নয়—
দুঃখ জানি মুখোমুখি ব'লে
গোপন ব্যাধির সঙ্গে সংলাপ নিরত ।
একমাথা মেঘ নিয়ে চোখে ঘুম নেই—
এলোমেলো বাতাসেতে
অদূরে দাঁড়িয়ে ঝাউ শুধু ছলছেই ।
বটের ঝুরির মতো চিন্তা শুধু নামে
দক্ষিণে ও বামে ।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়
স্বপ্নচারণার ভূমি

সকলেরই কিছু কিছু স্বপ্নচারণার ভূমি রয়েছে, যেখানে
বহু পদযাত্রা শেষে হতমান হৃতসর্বস্বেরা ভয়জান্ন টেনে টেনে
কিরে আসে ; সেরকম নিজেই চিহ্নিত কোরে রাখা
তার কবরের জমি

কেউ কেউ, দাম বা, মিটিয়ে দিবে তারপর নিশ্চিন্ত নির্ভর ;
পৃথিবীর হুখস্থান্য আনন্দের বাবতীর উত্তরাধিকার
এ জন্মে নিঃশেষ কোরে যেতে পারলোনা বলে মৃত সম্রাটেরা
সঙ্গে কোরে নিয়ে গেছে পিরামিডে জীবন্ত মানুষ
ক্রীতদাস ক্রীতদাসী,

সোনার ভূজার থেকে ছড়িয়েছে ফুলের নির্ধাস,
তারপর শব হয়ে মমির ঈষৎ দূরে পাথুরে বিছানায় শুয়ে আছে ।
তাদেরও তো স্বপ্ন ছিলো, শিশুদের, যুবক যুবতী বৃদ্ধ সকলের ছিলো ।
ব্যথিত চোখের কোলে বিশাল পাখির ডানা শুয়েছিলো, থাকা স্বাভাবিক !
এই জগতের তারা অধিবাসী হয়ে উর্বরতা, বৈদান্তিক
পাখির মতন সব ফেলে রেখে উড়ে যাবে যে কোনো মুহূর্তে—এককম
অবিস্মৃতকারী তারা ছিলো না ;

ফসল বুনে, ফসলের বোঝা বয়ে এনে
গোলাঘরে রেখে ওই ধূলোমাখা বালকের ঘর
সাজিয়ে রেখেছে ;
এই স্বপ্নচারণার ভূমি তাদেরও যেটুকু ছিলো, আমাদের নেই ।

শিশির সামন্ত

অসংগতি

আমরা আরোহী নই, আমাদের নেই কোন উটের জাহাজ
শুধু ছরাশার এক মরুভূমি, আমাদের স্বপ্ন ছিলো, আশা
কল্পনার মুদ্রা ছিলো, সত্যতার সাথে ছিলো জীবন বাপন,

তুমি বলেছিলে তবু আশাবাদী, মর্যাস্তিকভাবে তা ফুরিয়ে
নিঃশেষিত যে জীবন, তুমি করো হতাশাকে প্রতিদিন জয় ;

তোমাকে দেখাবো আমি নতুন শহর, গাছপালা, ফাঁকা
মুক্ত বাতাসের এক প্রশস্ত আকাশ, ক্লাস্তি ঘেঁরা গুঁড় হতাশাস—
মর্ময়িত হয়নিকো যে শহরে ; স্বপ্নে আমি প্রতিদিন দেখি
আমাদের পিছোর বিশ্বাস !

আমাদের প্রত্যাশা পিছোর, ইদানীং দেখি কদাচিত
স্বপ্ন, দেখি কদাচিত, পূর্ণতার মেঘে তুমি আততিতে
আমাকে প্রশ্ন দাও কেন ? স্বপ্ন দেখাও কেন বারবার ?

আমরা আরোহী নই, আমরা বালির দেশ তৃষ্ণা নিয়ে পেরোতেই
যাযাবর বৃত্তি বাড়ে, এখানে অর্কিড, কাঁটা ঝোপ,
সুধুমাত্র জলসেচ লাবণ্যেতে, শস্য শ্রামল তুমি,
এই পরিবেশে কিছু মেলাবে না সাধ ও সাধনা, অসংগতি !

অজিত বসু

ভূত ও ভবিষ্যৎ

ই। করে আসত ভূত

সে ছিল গপ্পো

ছমছমে অঙ্ককারে —

আসতো না, কিংবা হয়ত বা অপেক্ষায় ছিল
আসবে কি আসবে না, এমন দোটানা ।

সেই মুশকিলটাই হ'ল

ই। করে এল মন্ত ই।

বলল, কোথায় যাবি যা—

বলে উত্তর দক্ষিণ পূবে পশ্চিমে দিল তাল।

দিলাম তারই গলায় মালা

হ'ল তরল লোহা পিতল গালা ;

ভূত বললে, আচ্ছা,

বৈচে থাক শূয়োরের বাচ্চা ।

অমিয় ধর

কালের সন্ধ্যাই সমাগত

ছায়াকার মন্থন সচ্ছল যেদে মুখল পর্বের অভিলাষ !
 হে কেশব ! বার্ষিক স্বজনের আলিঙ্গনে আত্মহারা তুমি ।
 তোমার-ই প্রসন্ন, স্বেচ্ছাচারিতার মুখল প্রসব করে
 যদ্বংশ আত্মহননের পথে অনিবার্হ গতি ।
 শিথিল ন্যায়ুতে আজ আপসের দুর্বলতা ;—
 হে কেশব, পাঞ্চজন্তে বর্ষরতা ঠেকানো যাবে না !
 আদরের বংশীধ্বনি প্রাত্যাখ্যান করে,
 দম্ভদলের সাথে স্ব-ইচ্ছার চলে যাবে সহস্র গোপিনী !

গোকুলের কর্মিষ্ঠ জীবনে ছিলে,
 রোদে-জলে কষ্ট পাথরের পেশী,
 গোপবালিকার প্রেমে সিংহাসন পাতা—
 একি শুধু পূর্বস্মৃতি ?
 তোমার-ই তো জানা, ব্রজের রাখাল—
 ছুটবলদের থেকে কেন শ্রেষ্ঠ শূন্য গোহাল !
 তবে কেন ছুটতি দমনে ক্লৈব্য ?
 একি স্বজনপোষণের আদি পাপ,
 নাকি বয়সের দুর্বলতা ?

গুপ্ত ঘাতকের শরে মৃত্যুবরণের আগে
 হে কেশব, প্রকৃত-ই স্বজন-স্বহৃদ যারা
 পাঞ্চজন্তে ডেকে বলা—
 ফিরে আয়, বর্ষরের কঠিন আঘাতে
 কালের সন্ধ্যাই সমাগত ।

মুকুল গৃহ

আমাদের জীবন স্বাপন

পড়েছিল আলতা একফোটা ঝকঝকে
 মেঝের শরীরে, কত্যা হেঁটে গেছে বুঝি, কিয়ৎক্ষণ
 আগে, তাঁর বুকের শব্দ বেজেছিল, দিনান্তের রোদুর্
 তখনও স্নান, পাখিদের কলরব থেমেছিল, গৃহে তাঁরা
 কিয়ৎদিনে দিনান্তে, তৃপ্ত, অতৃপ্ত পাখিরা—

শহরেও সন্ধ্যা নেমেছিল, সেজবাতি হাতে
 কত্যা এসেছিল বুঝি, তার লাল ক্লান্ত, অস্থির চোখে কিছু
 কথা ছিল, আজকাল আমাকে বলে না আর তার কথা ।
 তার পৃথিবীটা ভিন্ন হয়ে আমাদের বৃদ্ধ করে যায়,
 দিনান্তের তৃপ্ত কিংবা অতৃপ্ত আমরা—

নদী একস্রোতা, নদী কি বোঝে না তার
 মুখ তীরে কিশোর দাঁড়িয়ে, তাকে একটু সিক্ত করা
 প্রয়োজন ছিল । নারী বহুস্রোতা, নারী কি বোঝেনা
 তার মুখ জাহ্নু, স্তন ঘিরে সারাক্ষণ অপেক্ষা করেছে বরষ,
 স্থির হয়ে দাঁড়ায় বাস্তব, আর অস্থিরতা, ঝড় —

তৃপ্ত, অতৃপ্ত পাখিদের সঙ্গে আমাদেরও
 সিক্ত হতে সাধ যায়, তাই ফেরা, তাই ঘরে ঘরে ফেরা ।

প্রদোষ দন্ত

একদিন সেইদিন

চারিদিকে মিছিলের বহুতা, কোলাহল,
 বুকের হাপরে হামা দিয়ে ছোটো কাকুতি-প্রয়াস,
 সমাজ সংস্কার মাহুস ঈশ্বর ধুলিসাৎ ।
 শুধু প্রকট হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর আকস্মিকতার তাণ্ডবরূপ ।
 কোথাও বীভৎস ভাঙন, ভেঙে পড়ে
 অরবাড়ি গাছপালা ক্ষেত-খামার ।

মামুষ ভেবেছিল ঘর আছে, আছে
 প্রেম-ভালোবাসা, প্রিয়জন,
 দেবতা-মন্দির আছে ।
 এখন কিন্তু যেদিকে তাকাও নাড়া-ওঠা জমিন,
 চারিদিকে মরাগাছ, কোথাও থিকিথিকি দাবানল,
 হাড়ের জাঁজাল ।

একদিন সেইদিন এই হাড়েই
 বাস্তব দুর্গ ভাঙার মত জোট বাধে,
 শকা মুছে যায় ।

অলককুমার চৌধুরী
 এখনো সময় আছে

ডুমুরের ফুল তুমি, সাবেকি জোয়ার
 অঁচলে রেখেছ ঢেকে
 পারবে তা কতদিন আর
 মন কেমন বাতাসে সরে যাবে
 বুকের বসন
 সামনে দাঁড়াবে এসে
 থরথর ঠোঁটের কাঁপন বলে দেবে
 আগুনের কথা হৃদয়ে গোপন
 সুদীর্ঘ শাড়ির পাড়ে বেদনার চোরকাটা গাঁথা
 তবে কেন অকারণ উদাসীন অবহেলা
 বাসস্তিক স্বচ্ছ জলে
 বয়সের পলি মিশে গেলে
 সেই ঘোলাজলে
 যাবে নাকো দেখা আর হৃদয়ের মুখ

তোম সে স্বস্তির হাতে সঁপে দেবে

তোমার অন্তঃ

শূন্য থা থা প্রথম বয়স

বাজা মাঠ কাকরের কাঁটা

জীবনের মজা বিলে দল দাম শুধু দল দাম

এখনো সময় আছে

নেমে এসো শ্রাবনের জলে ও কাদায়

পাশাপাশি আনত ডঙ্কিতে

সারি সারি করে যাই জীবনের সেরা বীজধান ।

কালীকৃষ্ণ গুহ

বসন্তের হাওয়া

বসন্তের হাওয়া, তোমাকে পেলাম আজ ব্রীজ পার হয়ে ।

ব্রীজের মাথায় কারা তুচ্ছ এক নিশান তুলেছে ?

ব্রীজের এপাশে দেখি পরিত্যক্ত বৃদ্ধদের জ্ঞান এক

বাড়ি গড়ে উঠেছে খুব দ্রুত ।

পৃথিবীর নাগরিক তারাও যাদের কোনো বাড়ি নেই, পরিচয় নেই ।

তারা কেউ ক্ষীণ দৃষ্টি, কেউবা বধির, তবু

পৃথিবীর পরিচয় পেতে চায় অত্যন্ত আগ্রহে ।

দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে ধরতে চায় কিছু —

অলুভব ক'রে নিতে চায় ।

যুদ্ধ হবে কিনা ভাবে । ভাবে :

যুদ্ধ হবে না কখনো, ক্রমশ শাস্তির দিকে যাবে এ সম্ভাব্যতা

অল্প স্থগা রক্ত অতিক্রম ক'রে যাবে ।

ভাবে : দূরে ওই হাসপাতালের মাঠে দেবদূত নেমে আসে

রোজ সন্ধ্যাবেলা

মৃত্যুহীন পৃথিবীর থেকে ।

বসন্তের হাওয়া, তোমাকে আমার মতোই তারা গ্রহণ করেছে ।

শুভ বসু

প্লাবন জোকার

হু চোখের সেই অনাবৃত আলোর

জাগল যখন জোয়ার,

তখন আমার অন্ধকারের কেন্দ্র জুড়ে

হেসে উঠল বজ্রমাণিক ।

ধু ধু বালুর চতুর্দিকে হাড়ে ও ককালে

দিগন্তটান লাগল তৃষ্ণা দহন তপ্ত হাওয়ার,

যেঘের ছোঁয়া বেন অহল্যা মাটির ভরতরাসে

শ্রামল স্বপ্নে রোমাঞ্চ আনে, সারা আকাশ মুখর হয়ে উঠে

সিঁদুর এবং পলাশ নিয়ে জলে স্থলে তুফান তুলে দেয় ।

এই কোটালে জীবন চেনে তিন ভুবনে বিস্তারিত পট ।

মরীচিকার লীলায় ভুলে তেপান্তরের অরণ্যে প্রাঙ্গণে

ছুটে চলার অভিজ্ঞতার ক্লাস্তি, জ্বালা, দংশন বিব ভুলে,

এই প্রাবনে অবগাহনে, এই কোটালে ভেসে

এবার বাঁচা তুলকালাম, মর্ত যতই প্রতিকূলের মুখোশ পরে থাক,

বিনাশ তার প্রচণ্ডতার ভুলে যতই দেখাক লোলুপ তৃষ্ণা !

অমিতাভ গুপ্ত

খনন পর্ব

যেখানে অন্ধার জলছে

যেখানে মাহুঘের কালোহাড়

জলছে অন্ধারে লৌহে

যেখানে পাথরের ধাতব

নখের দাগ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে

দেখছি শ্রম কোন মূল্যে

বিকোর, কার কাছে বিকোলে
 মাল্লব আরো ভালো অঙ্গার
 মাল্লব আরো ভালো লৌহ

বাজার জুড়ে ধোয়াশেনিনের
 প্রিয়তা, সেখানেই কিভাবে
 পৃথিবী পেট চিরে দেখালো

মাল্লব কার কাছে বিকোলে
 কিভাবে আরো ভালো অঙ্গার
 কিভাবে হয়ে ওঠে লৌহ

অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একসাথে

খানিকটা ভেঙে দিয়ে এসে যদি তোমার মতো আর
 একদিক গড়তাম, হয়তো একান্ত নিজের মতো কিছু
 হতো। কিন্তু আমি সবকিছু নিয়ে এগুতে গিয়ে
 পিছিয়ে পড়লাম, মাঝপথে দূরবীণ চোখে লাগিয়ে
 চারিদিক দেখলাম, তোমায় ঠিক ঠাণ্ডা করতে
 পারলাম না। বেশ দেয়ীতে যখন কাছাকাছি এলাম,
 দেখলাম—তোমার ঠোটে আর সেই মরণ বিজয়ী
 হাসি নেই; তোমার আয়ত চোখে বড় স্মিয়মান
 নক্ষত্রের ছায়া। আসলে, ভেঙে যেতে পারে, তবে
 আবার গড়ে দেয় কেউ, মাল্লবের বাচার চর্চা—
 এক অদ্ভুত বিশ্বাস। রাত যত ভেঙে যায়, তোমার
 আয়ত চোখে তত নক্ষত্রের নতুন বর্ণমালা। প্রতিটি
 নদীতে এখন একই চাঁদের প্রতিবিম্ব। স্থির বৃক্ষগুলি
 আমাদের রেখেছে ঘিরে অথও গ্রহণায়।

মনোজ নন্দা

যে আছে নিজের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে

যে আছে নিজের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে তার কোনো সহজাত ভীতি নেই,
ভয় নেই, ভলিয়ে যাওয়ার অতলে।

যে আছে নিজের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে তুমি তার হাত ধরো নির্ভয়ে
সে তোমাকে নিয়ে যাবে কসলের মাঠে।

উচু মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে মাছুষ সে জানে না—

পায়ের তলার তার কোনো মাটি নেই ;

একরাশ শূন্যতার ওপর দাঁড়িয়ে তার তর্জনী উঠে যায়

আরো শূন্যের ওপরই

কিষ্কা নেমে যায় অতল গহ্বরে...

তুমি তার হাত ধরে অঙ্ককারে কোন দিকে যাবে ?

যে আছে নিজের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে তুমি তার হাত ধরো নির্ভয়ে
সে তোমাকে জীবন দেখাবে।

অজয় নাগ

এসো পোশাক

এসো পোশাক ছুঁখী জনের

বলি আমার কথা মনের

এসো নিশীথ জল মেঘের

সুম ভাঙার স্নান ঘরের

রঙ পাখার খুব ভোরের

তাল নিবিড় গাঢ় বায়ুর

ছিল সেতার সারা দিনের

সব এখন গত আয়ুর

ছেড়ে গিয়েছে ভালো হয়েছ
 ফাঁপা স্বজন হুঁশী প্রাণের
 বাধ ভেঙেছে আলো জেগেছে
 চোখ-হৃদয়-কূল পেয়েছি
 লোক-আদির মূল প্রাণের
 ধূলি ভুবন ঘাট ছুঁয়েছি

অরবিন্দ পাল
 অরণ্যে জীবন

এখনও এখানে পড়ে রয়েছে
 ধূ ধূ মাঠ সবুজ গাছপালা
 আর সহস্র সরল মাছুষেরা

এখানকার বাতাসে
 এখনও রয়েছে মাটির সোদা গন্ধ
 আর মমতা জড়ানো ভালবাসা

মাথার ওপরে আকাশ...

এখানে বাতাসে
 এখনও খেলা করে
 জুঁই ফুলের গন্ধ
 শিশুদের কোলাহল

ফিরে এলাম—
 এই ভাল অরণ্যে জীবন
 সঙ্গী গাছপালা পানাপুকুর
 আর ওই সাদা মাছুষেরা ॥

শব্দ বসু

ক্যাকাশে ধানগাছের মতো

না

এখনো ডাক আসেনি

না আকাশ

না বাতাস

এখনো কেউ ডাকেনি।

ভেবেছিলাম

পাহাড় ডাকবে

সমুদ্র ডাকবে

জঙ্গল ডাকবে।

না

এখনো কোন ডাক আসেনি

ক্যাকাশে ধান গাছের মতো একই জায়গায়

শিকড় ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি ধূ ধূ মাঠের মধ্যখানে

জয় গোস্বামী

রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে

এসেছি বখন খালি হাতে কিরবো না

হাতের সামনে যা পাচ্ছি নেবো তাই

একই নেবো না, ভাইকেও দেবো, ভাই দেবে তার বোনকে

দিয়েছি বখন, কিরিয়ে নেবো না মনকে

এসেছি বখন, কিরবো না খালি হাতে

ধূলো ছুঁড়ে দেবো মৃত্যুর গারে, স্বামী ছেড়ে-বাওয়া মেয়েটির পায়ে

ও চলে আহুক আমাদের কাছে, আমি আর ভাই বেঁধে দেবো ওর বর

এসেছে বখন, আমরা দুজন, দুজনেই ওর বর

পেরেছি যখন, ফেরাবো না হাত খালি
 বাগানকে দেবো হৃদয় মতো মালী
 দিনরাত্তির নেশা ক'রে ক'রে যত ছেলেপুলে রাস্তার ঘোরে
 সব ধ'রে ধ'রে বাড়িতে তুলবো
 বাড়ি হয়ে যাক খোলা মাঠ আর মাঠ ঘিরে দিক বন
 বন-জঙ্গলে আমরা ঘুরবো, প্রতিমূহর্তে অভূতপূর্ব,
 আমরা ঘুরবো আমরা আমরা আমি আমি আমি আমি
 আমার সঙ্গে আমিই থাকবো, ওগো অন্তরযামী

মৃতুল দাশগুপ্ত

রান্নাঘর

অবশ ধর্মের বশে । লোকচক্ষু তুচ্ছ করে
 শেকড় পুড়িয়ে খাই, ভাগ করি ত্রী পুত্রকল্যায়
 মহামাহুষের ঢেউ আছড়ে পড়ে রান্নাঘরে, একটু কাঠের জন্ত
 মহাকাশে জ্বল বানাই ।
 আমি কবি, দিগন্ত প্রহরী । একদিন নিঃশ্বাস ধামাবো, কিন্তু
 ভ্রমণ ধামবে না ।
 যাবো ছুন বরিয়ে বরিয়ে...চতুর্দিকে মূর্তিলোভী, বলিক, বিপ্লবী

অতনু বসু

প্রোমাৎসুর জাশ

জল প্রপাতের শব্দে বুকের ফাটল দেখা যায় ।
 আমি সে নগ্নতা বুঝি, ভেঙে যাই, তবুও হারিনি
 এই জাখো হু'হাতেই রক্ত-স্বতি, অথচ জ্বালানী
 ছিন্ন রাখি । জড়ো করি শুকনো শিকড়, কাঠ, জল ও বাকল ।
 ফেরার খুঁটির মতো এসেছি এখানে—
 আন্তরীণ বল হয় ।

শিক-পেরেকের থেকে মনে হয় কাঠ বেন প্রবল আত্ম
 ফিরে আসবেনা ব'লে চ'লে গেছে যে কঠিন আলো
 তবু সে বহনম হয়ে বিঁধে যেতে এসেছে চিবুকে
 পাথর-শিরায় খুঁজি সমগ্র কিশোর কাল, ছায়াশূন্য সাংকেতিক দাগ
 ছিন্ন যৌবন নাও, নির্বাসনে আসন পেতেছি ।...
 এখনো কি ভাঙাচোরা গেরস্তের সজল উঠোনে
 অকস্মাৎ উঠে বসে প্রেমাংশুর লাশ ?
 ভুল স্বপ্নে ভেঙে যায় বাদাড়ের নিভুল শাসন
 বিবর্ণ হত্যার দৃশ্য একদিকে ডেকে নিয়ে যায় ।
 কাঁধে ফেলি সরল কুঠার, নির্জন অগ্নিদিকে খুঁজি
 অজ্ঞারের লালে মাংস সৈকে নিতে এসেছে মাহুঘ
 প্রতিবাদহীন ভাঙা টাঙ্গ এসে লেগে আছে শিরশের কাছে ।

পরিচয় বসু

কবি প্রসবিনী মাতা

জেলের পাঁচিল

ছুরে ব'সে আছে

এক জননীর কান্না

প্রস্তরীভূত কালচে আকাশ

পরতে পরতে ঢুলছে

কারা যেন ক্যাপা বস্তার মতো ফুলছে ।

সারা পৃথিবীর সজমহীন রাস্তিরে আজ ঘুম নেই,

কারো ঘুম নেই ;

স্নাতকানা চোখ ভারি হ'য়ে আসে

ঠায় ব'সে তবু পোড়া চামড়ার মতো

কালো মাহুঘের হুঃখে কাঁপছে জেলের বাগানে

বাও বাও-এর পাতা ।

আঠাশের সেই সাজোয়ান কালো কবি

জান্নু পেতে ব'সে যেন লিখে যান্ন—

শোনো হে মানুষ শোনো

কোনো কবিতাই ব্যর্থ নয় তা জেনো

আজ আরো এক কবিতার রাত মাগো ।

নতুন ছন্দে মহাকাব্যের সূচনা পর্ব মাগো

আজ না হলেও কাল স্বাধীনতা আসবেই

সিংহের ঘন হৈ-হুল্লোড়ে জেনো আফ্রিকা ভাসবেই

কবি থাকবে না ট্রাইবাল নাচে সারা রাত্তির জেগে

কবি রয়ে যাবে কেন্টের ঘাসে অগ্নিকুন্ডম হয়ে ।

শ্রেমে-প্রতিশোধে একাকার প্রিয় কবিতার মতো

দাঁড়িয়ে রয়েছে সিল্যুয়েট কালো মানুষ

মৃতদেহ নিয়ে মিছিল বেরোবে দিকারে দিকারে

আঠাশের সব মরদ কবির ছিঁড়বে মাথার চুল

এ গ্রহের যতো দরদী মানুষ সমাধিতে দেবে

তাজা লাইলাক ফুল ।

ভালোবাসা, তুমি কত ভালোবাসা দিতে পারো দেখি আজ

প্রেম, তুমি আরো কত প্রেম দিতে রাজি থাকো দেখি আজ ।

ভাবতে ভাবতে ফুরিয়ে গিয়েছে কবে

বেদনার নীল খাতা

রাগী ছনিয়ার শ্রেষ্ঠ কবিতা হ'য়ে—

জেলের পাঁচিলে হাত দিয়ে আছে কবি প্রসবিনী মাতা ।

মলয় পাত্র

বন্যা

বৃষ্টি এসেছিল, গেছে খেমে ।

মা'র কাছে ভাত চেয়ে যে ভিক্ষুক দাঁড়াতো দুয়ারে
সেত জানে. এ অজ্ঞাণ

পাকা ফসলের জাণে ম' ম' ক'রে উঠবেনা আর,
মিলবে না ভাত ;

বন্যা লবে নিয়ে গেছে ধানের আজ্ঞাণ :

পাকা ধান

ফসলের জাণ, মিলবে না আর

মিলবেনা ভাত ;

সে ভিক্ষুক জানে

যা ছিল ভেসেছে সব বানে ।

তকতকে হ'রে আছে সাজানো গোয়াল

ভেসে গেছে গাই ;

একটা কে ছিল যেন মা'র কোণ জুড়ে

গেছে সেও, কোল ফাঁকা তাই ।

ভিক্ষুক কিরেছে পিছু । সেও জানে

বৃষ্টি নেমেছিল, গেছে খেমে ;

জল এসেছিল, গেছে নেমে ;

ঘরে ঘরে বিশ্বাসের মেটে ভিত ন'ড়ে গেছে

যা ছিল টেনেছে সব, বানে ।